POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

এবং তোমার পূর্বেও রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে উহাই পরিবেষ্টন করিয়াছিল যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

(আল আনআম: ১১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 1-2

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6-13 জানুয়ারী, 2022 2-9 জামাদিউস সানি 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অসুস্থ ব্যক্তি বাহনে পড়ে তোয়াফ করবে।

১৬৩২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহ্ তোয়াফ করছিলেন আর তিনি উটের উপর আরোহিত ছিলেন। তিনি (সা.) যখন হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) -এর সামনে আসতেন, তখন তিনি নিজের হাতে থাকা একটি বস্তু দ্বারা সেটির দিকে ইঙ্গিত করতেন আর আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করতেন।

১৬৩৩) হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে নিজের অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন, উটে চেপে লোকেদের পিছনে থেকে তওয়াফ কর। আমি তওয়াফ করলাম আর রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহ্‌র এক পাশে নামায পড়ছিলেন। তিনি সূরা 'ওয়াততুরে ওয়া কিতাবিম মাসতুর' তিলাওয়াত করছিলেন।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদিন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) বলেন:১৬৩২ নম্বর হাদীসে অসুস্থতার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু আবু দাউদ (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন সেখানে এই শব্দ রয়েছে-

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ
يَشْتَكِيْ فَطَافَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) অসুস্থ অবস্থায় মক্কা আসেন। তাই তিনি উটে চড়ে তওয়াফ করেন। দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসা কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ত তার জন্য সহজসাধ্যতা রেখেছে, তাকে হজ্জের পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয় নি। এমন ব্যক্তি বাহনে চড়ে তওয়াফ করতে পারে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হজ্জ, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

সততা ও বিশ্বস্ততার সেই গৌরবান্বিত পুরুষকে কুর্নিশ! যিনি খোদা তা'লা নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করাকে পছন্দ করেন নি, এর বিপরীতে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহন করতে প্রস্তুত হয়েছেন।

হযরত ইউসুফ খোদা তা'লার কৃপা ও সৌন্দর্যের প্রেমে বিভোর হয়ে ছিলেন। কোনও ভাবেই তিনি খোদা নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা পছন্দ করতেন না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

যদি অতীতে এর দৃষ্টান্ত খুঁজতে হয়, তবে সেটি ইউসুফ (আ.)-এর সততা ও বিশ্বস্ততা। তিনি সততা ও বিশ্বস্ততার সেই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যে কারণে তিনি সিদ্দীক নামে অভিহিত হয়েছেন। একদিকে এক সুন্দরী তথা অভিজাত রমনীর নির্লজ্জতার হাতছানি, যে একান্ত নির্জনতায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে চায়, কিন্তু সততা ও বিশ্বস্ততার সেই গৌরবান্বিত পুরুষকে কুর্নিশ! যিনি খোদা তা'লা নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করাকে পছন্দ করেন নি, এর বিপরীতে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহন করতে প্রস্তুত হয়েছেন, এমনকি বন্দীদশাকেও বরণ করে নিয়েছেন। তাই তিনি বললেন, رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ অর্থাৎ ইউসুফ দোয়া করলেন, 'হে আমার প্রভু প্রতিপালক! এ আমাকে যার দিকে আহ্বান করে, তার চেয়ে আমি বন্দিত্বকে পছন্দ করি। এর দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উন্নত চরিত্র এবং নবুয়তের আত্মাভিমান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি বিষয়টির উল্লেখমাত্র করেন নি। কি কারণে তিনি সে কথার উল্লেখ করেন নি? হযরত ইউসুফ খোদা তা'লার কৃপা ও সৌন্দর্যের প্রেমে বিভোর হয়ে ছিলেন। নিজ প্রেমাস্পদের তুলনায় কোন কিছুর সৌন্দর্যই তাঁকে আকৃষ্ট করত না। কোনও ভাবেই তিনি খোদা নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা পছন্দ করতেন না।

কথিত আছে যে তিনি দীর্ঘ বারো বছর কারাযাপন করেছেন। কিন্তু এই সময়কালে কখনও তিনি কোনও ধরণের অভিযোগ করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর বিধি বিধানের উপর তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থেকেছেন। এই সময়কালে তিনি পুনর্বিবেচনা বা নিজের মুক্তির জন্য বাদশহাকে কোনও আর্জিও জানান নি। বরং কথিত আছে যে, সেই স্বার্থান্ধ মহিলাটি যাতনা দেওয়ার প্রক্রিয়া ক্রমে বাড়াতে থাকে যাতে কোনও ভাবে তাঁর পদস্খলন ঘটে। কিন্তু সেই সিদ্দীক নিজের সততা ও বিশ্বস্ততা বিসর্জন দেন নি। খোদা তা'লা তাঁকে সিদ্দিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। এটিও সিদ্দিকের এক পদ মর্যাদা, পৃথিবীর কোন বিপদ, দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা তাকে খোদা নির্ধারিত সীমা রেখা লঙ্ঘন করতে প্রণোদনা দিতে পারে না। যাতনা ও বিপদাপদ যতই বৃদ্ধি পায় সেটি তার সততা ও বিশ্বস্ততার মর্যাদাকে আরও দৃঢ় ও উপভোগ্য করে তোলে।

বস্তুত, যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি, মানুষ যখন ***ইইয়াকা নাবুদু*** উচ্চারণ করার পর সততা ও বিশ্বস্ততা সহকারে কোন কাজ করে, তখন খোদা তা'লা সততা ও বিশ্বস্ততার এক বিশাল নহর উন্মুক্ত করে দেন যা তার হৃদয়ের উপর এসে পড়ে এবং তা সততা ও বিশ্বস্ততায় পূর্ণ করে দেয়। সে নিজের পক্ষ থেকে কিছু অর্থ নিয়ে আসে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রতিদানে উৎকৃষ্টমানের মূল্যবান জিনিস ফিরিয়ে দেন। এর দ্বারা আমি এতটুকুই বোঝাতে চাইছি যে, মানুষের এই পদমর্যাদায় এতটা উন্নতি করা উচিত যে, সেই সততা ও বিশ্বস্ততা যেন তার পক্ষে নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়। এমন ব্যক্তির জন্য ঐশী জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতার সাগর উন্মুক্ত হয়, তাকে এমন শক্তি দান করা হয় যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা সকলের থাকে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৫)

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসার প্রেরণা বিদ্যমান, কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্য লাভকারী ব্যক্তির চিন্তাশক্তি ঐশী জ্যোতি লাভ করে, অন্যজন তা থেকে বঞ্চিত থাকে।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ
وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল-এর উপরোক্ত ২নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন- "হয়তো কেউ আপত্তি করবে যে, মানুষের প্রধান খাদ্য প্রাণীর মাংস নয়, কেননা পৃথিবীর এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা নিরামিষ ভোজী। কিন্তু এমন আপত্তি বিবেচনাহীনতার পরিচায়ক। কেননা, যারা নিরামিশভোজী হওয়ার দাবি করে, তারা মাংস খায় না ঠিকই, কিন্তু তাদেরও প্রধান খাদ্য প্রাণীজ হয়ে থাকে। মাতৃদুগ্ধ ছাড়া কতজন শিশু হয় লালিত হয়? মায়ের দুধ

এরপর ৯ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: ভার্চুয়াল সাক্ষাত অনুষ্ঠানেই আরও একজন প্রশ্ন করেন যে, কোরোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তবলীগের কাজ কিভাবে করা যেতে পারে?

উত্তর: হোয়াটস আপ ও সোশাল মিডিয়ার মত অন লাইন প্লাটফর্মে তবলীগ অনেক বেশি শুরু হয়েছে। সেখানে দেখুন যে লোকেদের কি কি প্রশ্ন রয়েছে। কি কি সমস্যা রয়েছে। বিভিন্ন সাইটস রয়েছে, সেখানে মানুষদের বলুন যে এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে নাস্তিক না হয়ে, খোদাকে ত্যাগ না করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ঝুঁকতে হবে, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তাঁকে চিনতে হবে। একথা মনে করবেন না যে খোদা তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করেন না, বা খোদা তা'লার অস্তিত্ব নেই বা এই জগতই সব কিছু। পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এই কাজ করতে হবে। কেননা এর পর যে সংকট আসবে, এই মহামারির পর পৃথিবীর অর্থনীতির মধ্যে যখন আলোড়ন সৃষ্টি হবে তখন যে সংকট আসবে তা হল বিভিন্ন দেশ অপরের সম্পদ দখল করার চেষ্টা করবে, আর এর ফলে যুদ্ধ হবে, যার জন্য জোট তৈরী হয়, আর এই জোট ইতিমধ্যেই তৈরী হতে শুরু করেছে। এর থেকে রক্ষা পেতে একটাই পথ। খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন কর।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সারা জগতের মানুষের সম্পর্ক রয়েছে-এই মিডিয়াকে আপনারাও কাজে লাগান। আর সেই মাধ্যমটিকে আপনারাও কাজে লাগান যা সারা পৃথিবী কাজে লাগাচ্ছে। আজকের যে সব আলোচনা হল, সেগুলিকেই বাস্তবায়িত করুন। আর যে কয়েকটি জরুরী কথা ছিল তা আমি বলে দিয়েছি। অর্থাৎ ন্যাশনাল আমেলার সদস্যদের দায়িত্বাবলী কি আর আমেলা সদস্যদের সঙ্গে যে কথাগুলি আমি বললাম, সেই একই কথা বিভিন্ন মজলিসের সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীদেরকে বলছি। তাদেরকেও একথা স্মরণ রাখতে হবে এবং সেই মত নিজেদের নীতি নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়িত করতে হবে। যদি তৃণমূল স্তরে সব কাজ হতে শুরু করে এবং আপনাদের মজলিসের প্রত্যেক বিভাগের সেক্রেটারী নিজের নিজের কাজ করে, নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করে, তবে ন্যাশনাল আমেলার কাজ সহজ হয়ে যায়। আর সেই উদ্দেশ্যই পূরণকারী হয় যাদের জন্য তাদেরকে পদাধিকারী বানানো হয়েছে। আর এভাবে আপনারা যুগ খলীফার সাহায্যকারীও হয়ে ওঠেন। আর জামাতের সেবার কাজও সঠিকভাবে সম্পন্নকারী হন। আর এর ফলে খোদার দৃষ্টিতেও আপনাদের খিদমত গৃহীত হয়। কিন্তু যদি কেবল পদ কাছে রেখে দেওয়া হয়,কাজ না করা হয়, নিজের অসৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়, দোয়ার প্রতি মনোযোগ না থাকে, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা না থাকে, কেন্দ্রীয় বিভাগ এবং অঙ্গ - সংগঠনগুলির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা না থাকে, তবে এমন পদাধিকারীদের দ্বারা কোন উপকার হয় না। আর আপনারা আমার সঙ্গে কিম্বা জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তঞ্চকতা করতে পারেন, কিন্তু খোদা তা'লার সঙ্গে এমনটি করা সম্ভব নয়। তাই সব সময় স্মরণ রাখবেন, প্রত্যেকটি কাজ করার সময় স্মরণ রাখবেন যে, খোদা তা'লা আমাদের প্রতিটি কাজ ও কথা দেখছেন ও শুনছেন। তাই আমাদেরকে সব সময় আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে। এর জন্য নিজেদের যাবতীয় শক্তিবৃত্তি এবং যোগ্যতা কাজে লাগাতে হবে, যাতে জামাতের জন্য কল্যাণকর ও সক্রিয় সদস্য হতে পারেন এবং সঠিকভাবে জামাতের সেবাও করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের রক্ষক ও সহায় হোন।

প্রশ্ন: জামাল=এর যুদ্ধে শাহাদতবরণকারীদের মর্যাদা কি ছিল, মেয়েদের সাক্ষী অর্ধেক হিসেবে গণ্য করা হলে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীসগুলির মর্যাদা এবং উভয়লিঙ্গদের উত্তরাধিকার এবং সাক্ষীর বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ১৪ই জানুয়ারীর চিঠিতে লেখেন-

জামাল=এর যুদ্ধের বাস্তবতা হল এই যে, এর সমস্ত গতিবিধির পিছনে সেই সব নৈরাজ্যবাদী ও দুর্বৃত্তদের হাত ছিল যারা হযরত উসমানকে হত্যা করার পর মদিনা দখল করে ফেলেছিল। তারা মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং নিজেরাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যুদ্ধ বাধিয়েছিল। সেই যুগের ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের মাঝে বহু শতাব্দীর অন্তরাল রয়েছে, অনেক বিষয় সংশয়পূর্ণ রয়েছে, অনেক রেওয়ায়েত সত্য জানার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়াও ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক ধরণের সংশয় এর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে।

কিন্তু চিরন্তন সত্য সেটিই যা কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'লা সাহাবা এবং পুণ্যকর্মের বিষয়ে তাদের অনুবর্তিতাকারীদের সম্পর্কে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ এর ন্যায় ঈর্ষনীয় শব্দবন্ধন ব্যবহার করেছেন। এবং পশ্চাতবর্তীদের সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে তারা

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

দোয়া করে। অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদের ক্ষমা কর এবং ঈমানের বিষয়ে আমাদের যে সমস্ত ভাইয়েরা এগিয়ে গিয়েছে এবং ঈমান আনয়নকারী সেই ভাইদের জন্য আমাদের হৃদয়ে কোনও বিদ্বেষ থাকতে দিও না।

কাজেই এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণের উপস্থিতিতে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, সেই যুদ্ধে মুনাফিকদের দুর্বৃত্তি এবং প্রতারণার শিকার হয়ে উভয় পক্ষের শহীদ হওয়া সাহাবীরা নিশ্চয় নিরপরাধ ছিলেন। তাঁদের পদমর্যাদা বিচার করার এবং সে সম্পর্কে ফতোয়া দেওয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই।

মহিলাদের সাক্ষী অর্ধেক মর্যাদা রাখে এমন ধারণা সঠিক নয়। যে সব দৈনন্দিন বিষয়ে মহিলাদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে না, সেই সব বিষয়ে যদি একান্ত বাধ্য হয়ে মহিলাদের সাক্ষী গ্রহণ করতে হয়, সেক্ষেত্রে কুরআন করীম সাক্ষীদানকারী মহিলার সঙ্গে আরও একজন মহিলাকেও যুক্ত করার নির্দেশ দেয়। (যেহেতু সেই সব বিষয়ের সম্পর্ক মহিলাদের সঙ্গে নেই), তাই সাক্ষ্যদানকারী মহিলা যদি কোন কথা ভুলে যায়, তবে দ্বিতীয় মহিলা তা স্মরণ করিয়ে দিবে। অন্যথায় সেই একজন মহিলাই সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে।

আর যে সব বিষয় বিশেষভাবে মহিলাদের সাথে সম্পর্ক রাখে, সেগুলিতে কেবল একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারাই হুযুর (সা.) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আকবা বিন হারিস এক মহিলাকে বিয়ে করলে একজন সাধারণ মহিলা এসে বলল, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই সে দুধ পান করিয়েছে। হযরত আকবা সেই মহিলার দুধ পান করেছিল কি না সে কথা তাঁর জানা নেই বললেও হুযুর (সা.) স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ করিয়ে দেন।

যতদূর উভয়লিঙ্গের উত্তরাধিকার পাওয়ার সম্পর্ক, তাতে বলা যায় যে, যে লিঙ্গের বৈশিষ্টাবলী প্রকট হবে, সেই অনুসারেই সে অংশ পাবে। যদি তার মধ্যে পুরুষের গুণাবলী বেশি প্রকট থাকে,তবে পুরুষের সমান অংশ পাবে আর যদি মহিলার গুণাবলী বেশি প্রকট থাকে তবে তাকে মহিলা হিসেবে গণ্য করে মহিলার সমান অংশ দেওয়া হবে। আর যদি উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য সমান সমান হয়, সেক্ষেত্রে হযরত ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয় অংশের মধ্য থেকে ছোট অংশটি পাবে।

প্রশ্ন: জনৈক ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে জানতে চান যে, ধর্মীয় জগতে চল্লিশ সংখ্যার কি বিশেষ কোন গুরুত্ব রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন- কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে দৈহিক পরিপক্কতা এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার মাঝে চল্লিশ সংখ্যার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কুরান করীমে আল্লাহ্ তা'লা মানুষ সৃষ্টির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

অর্থাৎ যখন পরিণত বয়সে উপনীত হল এবং বয়স তার চল্লিশ বছর হল।

হযরত মূসা (আ.) এর সম্পর্কে কুরান করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

অর্থাৎ আমরা মূসার সঙ্গে ত্রিশ রাত্রির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং সেগুলিকে দশ (রাত্রি আরও)-এর সঙ্গে পূর্ণ করেছিলাম। অতএব, তার প্রভুপ্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণতা পেল।

আমাদের প্রভু ও মান্যবর হযরত আকদস মহম্মদ মুস্তফা (সা.) কে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়্যতের সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা.) বলেছেন, মানুষ মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রাণু রূপে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংস পিণ্ড রূপে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতার মাধ্যমে তাতে আত্মা ফুৎকার করেন। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত বা-জামাত নামায পড়ে যে তাকবীর এবং তাহরীমায় অংশ নেয়, তার জন্য আগুন এবং কপটতা থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হোশিয়ারপুরে চল্লিশ দিনের চিল্লা করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইসলামের সম্মান এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য এক প্রতিশ্রুত পুত্র সন্তানের মহান সুসংবাদ দান করেন। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গযাপন করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করবে।

তাছাড়া চল্লিশ বছর বয়সটি পরিণত বয়স হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কারণেই জামাত আহমদীয়ায় চল্লিশ বছর বয়স থেকে আনসারুল্লাহ্ সংগঠনের সদস্য ধরা হয়। অতএব, এই উদাহরণগুলি থেকে প্রমাণ হয় যে, চল্লিশ সংখ্যাটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপক্কতা এবং আধ্যাত্মিক পূর্ণতার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(এরপর ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় ..)

জুমআর খুতবা

আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ বলতেন, আমি নামাযের শেষ সারিতে থাকা অবস্থায় হযরত উমর (রা.)'র কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছি। তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করছিলেন, إِنَّمَآ أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ অর্থাৎ আমি তো আমার দুঃখ বেদনা কেবল আল্লাহ্‌র সমীপেই নিবেদন করে থাকি।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত ১৯ শে নভেম্বর, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৯ নবুয়ত, ১৪০০ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: সাহাবীদের পূর্বাবস্থা এবং ইসলামগ্রহণ করার পর তাঁদের আচরিত জীবনে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত উমর (রা.)'র একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যদিও পূর্বেও এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি কিন্তু এখানে এ প্রেক্ষাপটেও বর্ণনা করছি। তিনি (রা.) লিখেছেন, দেখো! সাহাবীরা কীভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হয়েছেন আর কীভাবে তাঁরা বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করেছেন। এভাবে যে তারা চেষ্টা-সাধনা করেছিলেন। নতুবা তারা তো সেসব লোকই ছিল যারা মহানবী (সা.)-এর প্রাণের শত্রু ছিল এবং তাঁকে গালিগালাজ করত। হযরত উমর (রা.), যিনি মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর দ্বিতীয় খলীফা হন, প্রথমদিকে মহানবী (সা.)-এর এমন চরম শত্রু ছিলেন যে, তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে একজনের সাথে দেখা হলে সে জিজ্ঞেস করে, (উমর) কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করতে যাচ্ছি। সে ব্যক্তি বলে, প্রথমে নিজের বোন ও ভগ্নিপতিকে হত্যা কর, যারা মুসলমান হয়ে গেছে। এরপর (না হয়) মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করো। একথা শুনে তিনি চরম রাগান্বিত হন এবং নিজের বোনের বাড়ি অভিমুখে রওনা হন। সেখানে গিয়ে দেখেন (বাড়ির) দরজা বন্ধ এবং একজন পবিত্র কুরআন (পড়ে) শোনাচ্ছে আর তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি শুনছেন। তখনো পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয় নি, তাই সেই সাহাবী বাড়ির ভেতরে বসেছিলেন। হযরত উমর (রা.) দরজার কড়া নাড়েন এবং বলেন, দরজা খোলো। তাঁর আওয়াজ শুনে ভেতরের লোকদের মাঝে ভীতি সঞ্চার হয় যে, (আমাদের) হত্যা করবে; তাই তারা দরজা খুলে নি। হযরত উমর (রা.) বলেন, যদি দরজা না খোলো তাহলে আমি (দরজা) ভেঙ্গে ফেলব। তখন তারা কুরআন আবৃত্তিকারী মুসলমানকে লুকিয়ে রাখেন আর ভগ্নিপতিও লুকিয়ে পড়েন, শুধুমাত্র বোন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলেন। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কী করছিলে বল? আর কে ছিল যে কিছু পড়ছিল? তিনি ভয়ের কারণে কথা এড়াতে চান। হযরত উমর (রা.) বলেন, যা পড়ছিলে তা আমাকে শোনাও। তাঁর বোন বলেন, আপনি এর অবমাননা করবেন, তাই আমাদেরকে প্রাণে মেরে ফেললেও আমরা (আপনাকে তা) শোনাব না। তিনি বলেন, আমি অঙ্গীকার করছি, আমি কোনরূপ অবমাননাকর আচরণ করব না। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের অসম্মান করব না। তখন তারা পবিত্র কুরআন শোনান, যা শুনে হযরত উমর (রা.) কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং ছুটতে ছুটতে মহানবী (সা.)-এর কাছে যান। তরবারি তাঁর হাতেই ছিল। তাঁকে দেখে মহানবী (সা.) বলেন, উমর এমন অবস্থা আর কতদিন চলবে? একথা শুনে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, আমি আপনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম কিন্তু আমি নিজেই শিকারে পরিণত হয়েছি।

এটি হলো পূর্বে বর্ণিত পুরো ঘটনার সারাংশ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "প্রথমে এমন ছিল তাদের অবস্থা, যা থেকে তারা উন্নতি করেছেন। আরো কিছু সাহাবীর কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সাহাবীরাই পূর্বে মদপান করতেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করতেন। আরো বিভিন্ন ধরণের দুর্ব লতা তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল , কিন্তু তাঁরা যখন মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করেছেন আর ধর্মের খাতিরে উদ্যম দেখিয়েছেন ও চেষ্টা-সাধনা করেছেন, এর ফলে কেবল নিজেরাই উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হন নি বরং অন্যদেরকেও উন্নত মানে উপনীত করার কারণ হয়েছেন। তাঁরা সাহাবী হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন নি বরং তারা অন্যদের মতই ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আমল করেছেন আর উদ্যম প্রদর্শন করেছেন ফলে সাহাবীতে পরিণত হয়েছেন। আজও যদি আমরা এমনটি করি তাহলে আমরাও সাহাবী হতে পারি।"

(আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮-৩৯)

হযরত উমর (রা.)'র খোদাভীতির অবস্থা কেমন ছিল- এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়েত আছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, ফুরাত নদীর তীরে যদি কোন একটি ছাগলও মারা যায় তাহলে আমার আশংকা হয় যে, আল্লাহ তা'লা কিয়ামতের দিন আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। অপর এক রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণি ত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, ফুরাত নদীর তীরে যদি কোন একটি উটও মারা যায় তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ তা'লা আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩২)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত উমর (রা.) সাথে যাই এমনকি তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করেন। আমার ও তাঁর মাঝে প্রতিবন্ধকস্বরূপ একটি দেওয়াল ছিল। তিনি বাগানের ভিতরে ছিলেন। আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি, 'বাহ্ বাহ্ হে খাত্তাবের পুত্র উমর! তুমি এখন আমীরুল মু'মিনীন। খোদার কসম! আল্লাহ্‌কে ভয় কর নইলে তিনি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দিবেন'।

(মোতা ইমাম মালিক, কিতাবুল কালাম ওয়াল আইনাহ ওয়াত্তাকা, পৃ: ৬০১, হাদীস-১৮৬৭)

হযরত উমর (রা.)'র আংটিতে এই বাক্য খচিত ছিল যে, 'কাফা বিল মওতে ওয়ায়েযান ইয়া উমারু', অর্থাৎ হে উমর! ওয়ায বা নসীহতকারী হিসাবে মৃত্যুই যথেষ্ট।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৬)

অর্থাৎ মানুষ যদি মৃত্যুকে স্মরণে রাখে তাহলে এটিই উপদেশ প্রদানকারী একটি জিনিস আর নিজের অবস্থা সঠিক রাখার জন্য এটিই যথেষ্ট।

আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ বলতেন, আমি নামাযের শেষ সারিতে থাকা অবস্থায় হযরত উমর (রা.)'র কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছি। তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করছিলেন, إِنَّمَآ أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ অর্থাৎ আমি তো আমার দুঃখ বেদনা কেবল আল্লাহ্‌র সমীপেই নিবেদন করে থাকি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও এই রেওয়ায়েতটি একটি খুতবায় উল্লেখ করেছিলেন এবং নিজ ভাষায় এর খানিকটা ব্যাখ্যাও এভাবে করেছিলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন শাহ্‌যাদ বলেন, একবার হযরত উমর (রা.) নামায পড়াচ্ছিলেন তখন আমি শেষ সারিতে ছিলাম কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর কাকুতিভরা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম আর তিনি আয়াতপাঠ করছিলেন, إِنَّمَآ أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ অর্থাৎ, আমি তো আমার প্রভুর সমীপেই আমার সব কাকুতিমিনতি উপস্থাপন করব অন্য কারো সামনে উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। অতএব, যারা যিকরে এলাহীতে রত থাকে তারা খোদার দরবার ছাড়া আর কোন দরবার পায়ই না যেখানে নিজের দুঃখকষ্টের আকুতি জানিয়ে নিজেদের

বুকের বোঝা হালকা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি শেষ সারিতে থাকলেও সেখান থেকে হযরত উমর (রা.)'র বুকফাটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

(খুতবাতে তাহের, খণ্ড-১৩, পৃ: ২৪৮-২৪৯)

প্রবীণ সেবক এবং ত্যাগ স্বীকারকারীদের প্রতি হযরত উমর (রা.) কীভাবে খেয়াল রাখতেন- এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত সা'লাবা বিন আবু মালেক বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মদীনায় বসবাসকারী মহিলাদের মধ্য হতে কতকের মাঝে ওড়না বিতরণ করেন। কিছু উন্নতমানের ওড়না হস্তগত হয়েছিল সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ভালো ওড়না রয়ে যায়। তাঁর পাশে যারা ছিল তাদের মধ্য থেকে একজন বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এটিকে মহানবী (সা.)-এর সেই কন্যাকে দিয়ে দিন যিনি আপনার কাছে আছেন। তিনি হযরত আলী(রা.)'র কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমের কথা বলছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, না, হযরত উম্মে সালীদ এর বেশি অধিকার রাখে। হযরত উমর (রা.) বলেন, হযরত উম্মে সালীদ সেসব আনসার মহিলাদের অন্যতম যারা মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। হযরত উমর (রা.)বলেন, তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন আমাদের জন্য মশক বহন করে নিয়ে আসতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৭১)

এছাড়া কুরবানীকারীদের নিকটাত্মীয়দেরও পুরস্কৃত করার উল্লেখ পাওয়া যায়। যায়েদ বিন আসলাম তার পিতার বরাতে বলতেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র সাথে বাজারে যাই। একজন যুবতী পেছন থেকে এসে হযরত উমর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, হে আমীরুল মু 'মিনীন! আমার স্বামী মারা গেছে এবং ছোট ছোট বাচ্চা রেখে গেছে। আল্লাহর কসম! তাদের ভাগ্যে ছাগলের পা-ও জুটছে না। তাদের কোন ক্ষেতখামারও নেই আর দুধের কোন প্রাণীও নেই। আমার শঙ্কা হয়, পাছে তারা দুর্ভিক্ষের শিকার না হয়ে যায়! আমি খোফা বিন ইমা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর সাথে হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) থেমে যান এবং সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) বললেন, বাহ্ বাহ্! খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অতঃপর হযরত উমর (রা.) ফিরে গিয়ে ঘরে বাঁধা একটি হৃষ্টপুষ্ট উট নিয়ে দুই বস্তা শস্যদানা ভরে উটের ওপর চাপালেন এবং এর সাথে সারা বছরের খরচের জন্য অর্থ ও কাপড়ও রাখলেন। অতঃপর সেই উটের লাগাম সেই মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, এটি নিয়ে যাও। এটা শেষ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তোমাকে আরো দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আমিরুল মু 'মিনীন! আপনি তাকে অনেক বেশি দিয়ে দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমার প্রতি ধিক্কার, অর্থাৎ তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন; আল্লাহর কসম! আমি এখনো তার পিতা এবং তার ভাইকে দেখতে পাচ্ছি। তারা দীর্ঘদিন ধরে একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন যা তারা অবশেষে জয় করেছেন। অতঃপর সকালে আমরা তাদের উভয়ের অংশ আমাদের মধ্যে বণ্টন করলাম। অর্থাৎ দুর্গ তারা জয় করেছিল, যার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সব মুসলমান ভোগ করে। বলতে গেলে আমরা তাদের অংশ থেকে বণ্টন করেছি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১৬০-৪১৬১)

অতএব এ কারণেই সে কিছু পাওয়ার যোগ্য।

বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এবং অভাবগ্রস্ত নারী ও মানুষের কীভাবে খেয়াল রাখতেন- এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত তালহা (রা.) বলেন, একদা হযরত উমর (রা.) রাতের আঁধারে ঘর থেকে বের হন, হযরত তালহা (রা.) তাঁকে দেখে ফেলেন। হযরত উমর (রা.) একটি বাড়িতে প্রবেশ করেন, এরপর অন্য আরেকটি বাড়িতে প্রবেশ করেন। প্রভাতে হযরত তালহা (রা.) সেসব বাড়ির একটি বাড়িতে গেলেন, সেখানে একজন অন্ধ বৃদ্ধা বসে ছিল। হযরত তালহা (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, যে ব্যক্তি তোমার কাছে রাতে আসে সে এসে কী করে? বৃদ্ধা উত্তরে বলে, তিনি অনেক দিন ধরে আমার সেবা করছেন, আমার কাজ করে দেন এবং আমার ময়লা পরিষ্কার করেন। একথা শুনে হযরত তালহা (রা.) অনুতাপের সঙ্গে নিজেই নিজেকে বলেন, হে তালহা! ধিক তোমার প্রতি। কী দুঃখের বিষয় যে, তুমি উমরের ছিদ্রান্বেষণে রয়েছ? এখানে বিষয় তো একেবারেই ভিন্ন। (সীরাত উমর ইবনে খাত্তাব, প্রণেতা- ইবনে জাওজি, পৃ: ৫৮) প্রজা সেবার এই মহান মানই হযরত উমর (রা.) প্রতিষ্ঠা করেন।

জনসাধারণ, অভাবী নারী ও শিশুদের চাহিদা পূরণের বিষয়ে হযরত উমর (রা.)-এর অনেক ঘটনা রয়েছে। গভীর খোদাভীতির সাথে তিনি (তাদের) চাহিদা পূর্ণ করতেন। আর তিনি (তাদের জন্য) বিচলিত হয়ে যেতেন। যখন তিনি দেখতেন যে, তার কোন প্রজার চাহিদা পূরণ হয় নি তখন তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হতেন। কিছু উদাহরণ আমি গত কয়েক সপ্তাহের জুমুআতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছি। যেমন- তিনি একবার যখন রাতে একজন মহিলাকে তার বাচ্চার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সে বলেছিল যে, উমর (রা.) যেহেতু দুগ্ধপায়ী শিশুদের জন্য রেশন নির্ধারণ করেননি। তাই আমি বাচ্চাকে খাবার খাওয়ার অভ্যাস তৈরির জন্য দুধ দিচ্ছি না, তাই সে ক্ষুধার জ্বালায় কান্নাকাটি করছে। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) অস্থির হয়ে পড়েন এবং তাৎক্ষণিকভাবে পানাহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন। এরপর ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি শিশুকে রেশন দেওয়া হবে।

(আল বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ, লি ইবনে কাসীর, পৃ: ১৮৫-১৮৬)

একইভাবে একবার একজন মুসাফির মহিলা, যার কাছে খাওয়ার কিছুই ছিল না। আর রাতে বিরতির জন্য শিবির স্থাপন করতে হয়েছিল এবং শিশু ক্ষুধায় কাঁদছিল তিনি যখন রাতে তা জানতে পারেন তাৎক্ষণিকভাবে ভাণ্ডার থেকে পানাহার সামগ্রী বহন করে তার কাছে পৌঁছে দেন এবং বিচলিত হয়ে পড়েন আর ততক্ষণ স্বস্তি পান নি যতক্ষণ পর্যন্ত খাবার রান্না করে সেই শিশুদের খাইয়ে তাদেরকে হাসতে না দেখেছেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন।

(আততাবারী লি ইবনে জারীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমরকে দেখ! তাঁর দাপট এবং প্রতাপে একদিকে জগতের বড় বড় রাজা-বাদশাহ্ কাঁপতো, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য কম্পমান ছিল, কিন্তু অপরদিকে অন্ধকার রজনীতে এক বেদুঈন নারীর সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখে উমরের ন্যায় মহান মর্যাদার ব্যক্তি অস্থির হয়ে পড়েন। আর তিনি নিজের পিঠে আটার বস্তা তুলে এবং ঘিয়ের কৌটা হাতে নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে যন আর ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরেন নি যতক্ষণ তিনি নিজ হাতে খাবার প্রস্তুত করে সেই শিশুদের না খাইয়েছেন আর তারা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে না পড়েছে।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২২, পৃ: ৫৯৬)

অতঃপর একটি ঘটনা হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রা.) যখন সিরিয়া থেকে মদীনায় ফিরে আসেন তখন মানুষের খবরাখবর নেওয়ার জন্য লোকজন থেকে পৃথক হয়ে যান। অর্থাৎ সেই কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিকে চলে যান, যেন সাধারণ জনগণের খোঁজ নিতে পারেন। তখন তিনি এক বৃদ্ধার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যে নিজ তাঁবুতে ছিল। তিনি তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে সে বলে, হে ব্যক্তি! উমর কোথায়? তিনি বলেন, তিনি এখানেই আছেন আর সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছেন। তখন সেই মহিলা বলে, আল্লাহ্ যেন আমার পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান না দেন। তিনি বলেন, তোমার জন্য পরিতাপ! তা কেন? অর্থাৎ তুমি এই কথা কেন বলছ? সে বলে, যখন থেকে তিনি খলীফা হয়েছেন, আজ পর্যন্ত আমি তাঁর পক্ষ থেকে কোন দানদক্ষিণা পাই নি, না কোন দিনার পেয়েছি না দিরহাম। (সেই বৃদ্ধা জানত না যে, ইনিই হযরত উমর) হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার জন্য পরিতাপ, উমর তোমার অবস্থা জানবেন কীভাবে? যখন কিনা তুমি এমন স্থানে রয়েছ, অর্থাৎ দূরে জঙ্গালের ধারে বসে আছে! তখন সেই মহিলা বলে, সুবহানআল্লাহ্। অর্থাৎ সুবহানআল্লাহ্। আমি মনে করি না যে, কেউ মানুষের শাসক হবে আর তার এটি জানা থাকবে না যে, তার সামনে, পূর্বে ও পশ্চিমে কী আছে। তখন উমর ক্রন্দনরত অবস্থায় নিজের প্রতি মনোনিবেশ করে বলেন, হায় উমর হায়! (এমন) কত দাবিদারই না থাকবে, হে উমর! প্রত্যেকেই তোমার চেয়ে অধিক ধর্মের জ্ঞান রাখে।এরপর হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, অত্যাচারিত হিসেবে তুমি তোমার অধিকার তাঁর কাছে কত মূল্যে বিক্রি করবে কেননা আমি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চাই। অর্থাৎ তিনি বলেন যে, হযরত উমরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চাই, তুমি বল যে, তুমি তোমার অত্যাচারিত হওয়ার অধিকার কত দামে বিক্রি করবে? সে মহিলা বলে, আমার সাথে ঠাট্টা করো না, আল্লাহ্ তোমার প্রতি কৃপা করুন। তখন হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, এটি ঠাট্টা নয়। হযরত উমর (রা.) তাকে বার বার বলতে থাকেন, অবশেষে তার অত্যাচারিত হিসেবে তার অধিকার ২৫ দিনারে ক্রয় করে নেন। এই কথা চলছিল এমন সময় হযরত আলী বিন আবি তালেব এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ সেখানে আসেন আর তারা উভয়ে বলেন, 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন' অর্থাৎ হে আমীরুল মু'মিনীন! আস্সালামু আলাইকুম। এতে সেই মহিলা তার হাত নিজের মাথায় রাখে এবং বলে, আল্লাহ্ মঙ্গল করুন, আমি আমীরুল মু'মিনীনকে তাঁর উপস্থিতিতে মন্দ কথা শুনিয়েছি!

তখন তাকে আমীরুল মু'মিনীন বললেন, তোমার ওপর কোন দোষ বর্তায় না, খোদা তোমার প্রতি কৃপা করুন। এরপর হযরত উমর (রা.) লেখার জন্য একটি চামড়ার টুকরো চেয়ে পাঠান কিন্তু তা পাওয়া না গেলে তিনি তাঁর গায়ে জড়ানো নিজের চাদর থেকে একটি টুকরো কেটে নেন এবং লিখেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। উমর অমুক মহিলার কাছ থেকে এটি আজকের দিন পর্যন্ত নির্যাতিতা হওয়ার অধিকার পঁচিশ দিনারে ক্রয় করেছেন মর্মে প্রত্যয়ন পত্র। এখন যদি সে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে হাশরের দিন দাবি উপস্থাপন করে তাহলে উমর তা থেকে দায়মুক্ত; আলী বিন আবি তালেব (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) এর সাক্ষী। এরপর সেই প্রমাণপত্র তিনি হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন এবং বলেন, আমি যদি তোমার পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করি তাহলে এটি আমার কাফনের সাথে রেখে দিও।

(ইযালাতুল খাফা আনিল খিলাফাতিল খোলাফা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৬-২৭৮)

সন্তানদের বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজার ক্ষেত্রে মানুষ কীরূপ মান নির্ধারণ করে, আজকালও আমরা দেখি যে, মানুষের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে। হযরত উমর (রা.) কীরূপ মানের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন- এ সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে। হযরত আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত, যিনি হযরত উমর (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন, কোন এক রাতে আমি আমীরুল মু'মিনীন এর সাথে মদীনার বিভিন্ন দিকে ঘোরাফেরা করছিলাম। তিনি ক্ষণিকের জন্য বিশ্রামের উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ালে হেলান দেন, তা একটি ঘরের দেওয়াল ছিল যার সাথে হেলান দিয়ে তিনি বসে পড়েন। তিনি শুনতে পান যে, ঘরের ভেতরে এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছিল, উঠো এবং দুধে পানি মিশিয়ে দাও। মেয়েটি বলে, আপনি জানেন না, আমীরুল মু'মিনীন-এর ঘোষক এই ঘোষণা করেছে যে, দুধে যেন পানি না মেশানো হয়। মা বলে, এখন আমীরুল মু'মিনীনও নেই আর তাঁর ঘোষকও নেই। মেয়েটি বলে, খোদার কসম! এটি তো আমাদের উচিত হবে না যে, তাঁর সামনে আমরা আনুগত্য করব আর পেছনে তাঁর অবাধ্যতা করব। হযরত উমর (রা.) একথা শুনে অনেক খুশি হন এবং তাঁর সাথীকে বলেন, হে আসলাম! এ ঘরটি চিহ্নিত করে রাখ, অর্থাৎ এর দরজায় একটি চিহ্ন একে রাখ। পরের দিন তিনি কাউকে প্রেরণ করেন এবং সেই মেয়ের বিয়ে তাঁর পুত্র আসেমের সাথে করিয়ে দেন। তার এই সততা এবং পুণ্য দেখে নিজ পুত্রের সাথে সেই মেয়ের বিয়ে করান। তার গর্ভে আসেম এর একটি কন্যা জন্মেছিল। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয এই মেয়েরই বংশধর ছিলেন।

(ইযালাতুল খাফা আনিল খিলাফাতিল খোলাফা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮১-২৮২)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সালামা বর্ণনা করেন, একবার আমি বাজার অতিক্রম করছিলাম। তখন হযরত উমর (রা.)ও কোন কাজে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে চাবুক ছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে সালামা! এভাবে রাস্তা ছেড়ে চলাচল কর। এরপর আমাকে আলতো করে চাবুক মারেন, কিন্তু চাবুক আমার কাপড়ের প্রান্তে লাগে। অতএব, আমি পথ থেকে সরে যাই আর তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান। এ ঘটনার পর এক বছর কেটে যায়। পুনরায় হযরত উমর (রা.)'র সাথে বাজারে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, হে সালামা! এ বছর হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কি? আমি বললাম, হে আমীরুল মু 'মিনীন! হ্যাঁ। এরপর তিনি আমার হাত ধরেন এবং আমাকে ঘরে নিয়ে যান আর একটি থলি থেকে ছয়শ' দিরহাম আমাকে প্রদান করেন এবং বলেন, হে সালামা! এগুলো তোমার প্রয়োজনে ব্যবহার কোরো আর এটি এক বছর পূর্বে আমি তোমাকে যে চাবুকাঘাত করেছিলাম তার জরিমানা। সালামা বলেন, আমি নিবেদন করি, আল্লাহ্‌র কসম আমীরুল মু'মিনীন! আমি এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম আর আজ আপনি আমাকে স্মরণ করালেন।

(সীরাত উমর ইবনে খাত্তাব, প্রণেতা- ইবনুল জাউয, পৃ: ৯৮)

হযরত উমর (রা.) এটিও লক্ষ্য রাখতেন যে, বাজারদর যেন এমন হয় যাতে কোন পক্ষের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। অতএব, এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, এটিও নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যে, লেনদেনের বিষয়ে যেন অনিয়ম না হয়। আমরা দেখি যে, ইসলাম এই অধিকারের বিষয়টিও উপেক্ষা করেনি। যেমন, ইসলাম বাজারদর বৃদ্ধি করা এবং অধিক মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে অনুরূপভাবে অন্যদের ক্ষতি করা এবং তাদের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতেও নিষেধ করেছে, যেমনটি বর্তমান যুগের বাজারে প্রচলিত রয়েছে। একবার মদীনায় এক ব্যক্তি এমন দামে আঙ্গুর বিক্রয় করছিল যে দামে অন্য দোকানীরা বিক্রয় করতে পারছিল না। হযরত উমর (রা.) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে বকাঝকা করেন, কেননা এভাবে অন্য দোকানীদের ক্ষতি হচ্ছিল। মোটকথা ইসলাম কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাস করতেও বারণ করেছে, যেন দোকানদারদেরও ক্ষতি না হয় আর সাধারণ জনগণেরও ক্ষতি না হয়।

(তফসীর কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩০৭)

আমের বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)'র কাছে আসে এবং বলে, আমার এক কন্যা ছিল যাকে অজ্ঞতার যুগে জীবিত কবরস্থ করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে মৃত্যুর পূর্বেই বের করে এনেছি। যখন সে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার ওপর আল্লাহ্ তা'লার দন্ডাবলীর একটি দন্ড আরোপিত হয়। অর্থাৎ অন্যায় কাজ সাধিত হয়, যার ফলে সে দন্ডিত হয়। তখন সে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে একটি ছুরি নেয়। আমি তাকে ধরে ফেলি, তবু সে তার কিছু শিরা কেটে ফেলেছিল। অতঃপর আমি তার চিকিৎসা করি। অবশেষে সে আরোগ্য লাভ করে। এরপর সে উত্তমরূপে তওবা করে। হে আমীরুল মু'মিনীন! এখন আমার কাছে এর জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসছে আমি কি এর পূর্বের বিষয়াদি সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করব যে, এর পূর্বের জীবন কীরূপ ছিল, এর সাথে কী কী ঘটেছে, আর সে নিজের সাথে কী করেছে? হযরত উমর (রা.) সেই ব্যক্তিকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার দোষত্রুটি পর্দাবৃত করেছেন, তুমি কি তা প্রকাশ করতে চাও?

খোদার কসম! তুমি যদি তার বিষয়াদি সম্পর্কে কাউকে কিছু বল তাহলে আমি তোমাকে পুরো শহরবাসীর সম্মুখে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব। এটি না করে বরং সেই মেয়েকে এক পবিত্র মুসলমান নারীর ন্যায় বিয়ে দাও।

(তফসীর তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা মায়েদা, পৃ: ১২৭) (অতীতের) সব কথা ভুলে যাও।

আমওয়াস-এর প্লেগ এবং মানুষের জীবনের জন্য হযরত উমর (রা.)'র কীরূপ চিন্তা ছিল এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, রামলা থেকে বায়তুল মাকদাসের পথে ৬ মাইল দূরত্বে একটি উপত্যকা রয়েছে, যার নাম হলো, আমওয়াস। ইতিহাসগ্রন্থে লিখিত আছে, এখান থেকে প্লেগ রোগের সূচনা হয় আর তা সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই এটিকে আমওয়াস-এর প্লেগ বলা হয়। এই রোগে সিরিয়ায় অগণিত লোক মৃত্যুবরণ করে। কারো কারো মতে এতে প্রায় পঁচিশ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। সতেরো হিজরী সনে হযরত উমর (রা.) মদীনা থেকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সার্গ নামক স্থানে পৌঁছে সৈন্যদলের সেনাপতিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সার্গ হলো সিরিয়া ও হেজাযের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তাবুক উপত্যকার একটি জনপদের নাম। আর তাঁকে এই সংবাদ জানানো হয় যে, আমওয়াস অঞ্চলে ব্যাধি ছড়িয়ে আছে। তখন পরামর্শের পর তিনি ফেরত চলে আসেন। এর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, এটি পূর্বেও একবার কিছুটা বর্ণিত হয়েছে, অপর এক বরাতে। হযরত উমর (রা.) যখন সার্গ নামক স্থানে পৌঁছেন তখন সেনাদলের নেতৃবৃন্দ হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং তার সাথীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, সিরিয়ায় প্লেগের মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। হযরত উমর (রা.) পরামর্শের জন্য প্রাথমিক মুহাজিরদের নিজের কাছে ডাকেন। হযরত উমর (রা.) তাঁদের সাথে পরামর্শ করেন। কিন্তু মুহাজিরদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কারো কারো মত ছিল যে, এখান থেকে পিছু হটা উচিত নয়। অপরদিকে কেউ কেউ বলেন, এই সেনাদলে মহানবী (সা.) -এর সম্মানীত সাহাবীরা রয়েছেন আর তাদেরকে এই মহামারিতে ঠেলে দেওয়া সমীচীন নয়। হযরত উমর (রা.) মুহাজিরদের পাঠিয়ে দেন এবং আনসারদের ডাকেন। তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু আনসারদের মাঝেও মুহাজিরদের ন্যায় মত পার্থক্য দেখা দেয়। হযরত উমর (রা.) আনসারদেরও ফেরত পাঠান এবং এরপর বলেন, কুরাইশদের জ্যেষ্ঠদের ডাকো যারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এসেছিলেন। তাঁদেরকে ডাকা হয়। তাঁরা সমস্বরে এই পরামর্শ দেন যে, এদেরকে সাথে নিয়ে ফিরে চলুন আর মানুষকে মহামারিকবলিত অঞ্চলে নিয়ে যাবেন না। হযরত উমর (রা.) মানুষের মাঝে ফেরত চলে যাওয়ার ঘোষণা করে দেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তখন প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্‌র তক্বদীর থেকে পলায়ন করা কী সম্ভব? হযরত উমর(রা.) হযরত আবু উবায়দাকে বলেন, হে আবু উবায়দা! হায় তোমার পরিবর্তে অন্য কেউ যদি এ কথা বলতো। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র তক্বদীর থেকে পলায়ন করে আল্লাহ্‌রই তক্বদীরের দিকে যাচ্ছি।

যদি তোমার কাছে উট থাকে আর তুমি সেগুলো নিয়ে এমন উপত্যকায় অবতরণ কর যার দুটি প্রান্ত রয়েছে, একটি সবুজ শ্যামল

আর অপরটি শুষ্ক, তাহলে কি বিষয়টি এমন নয় যে, তুমি যদি তোমার উটগুলোকে সবুজ শ্যামল স্থানে চরাও তাহলে তা আল্লাহ্‌র তকদীরের অধীনে আর তুমি যদি সেগুলোকে শুষ্ক স্থানে চরাও তাহলে তা-ও আল্লাহ্ তা'লারই তক্বদীরের অধীনে। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিমধ্যে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)-ও এসে গেলেন যিনি কোন ব্যস্ততার কারণে ইতিপূর্বে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি নিবেদন করেন, আমার কাছে এ সমস্যার সমাধান আছে। আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: 'যখন কোন স্থানে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে বলে তোমরা জানতে পারবে তখন সেখানে যেও না আর তোমরা যেখানে বসবাস কর সেই এলাকায় যদি মহামারী ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ো না।' একথা শুনে হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ফিরে যান।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তিব, হাদীস-৫৭২৯) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৪-২১৫)

হযরত উমর (রা.) মদীনা থেকে এসেছিলেন আর তখনও মহামারী কবলিত এলাকায় পৌঁছান নি তাই নিজ সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) যেহেতু সেনাপতি ছিলেন এবং আগে থেকেই মহামারি কবলিত এলাকায় অবস্থান করছিলেন তাই তিনি এবং মুসলিম সেনাবাহিনী প্লেগ-কবলিত এলাকাতেই থেকে গেলেন অর্থাৎ যে যেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থান করেন। মদীনা পৌঁছে হযরত উমর (রা.) সিরিয়ার মুসলমানদের বিষয়ে ভাবতে থাকে, তাদেরকে প্লেগের ধ্বংসলীলা থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়।

বিশেষভাবে হযরত আবু উবায়দার বিষয়ে হযরত উমর (রা.) চিন্তিত ছিলেন। একদিন হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে পত্র লিখে পাঠালেন যে, তোমার সাথে আমার একটি গুরুত্ব পূর্ণ কাজ আছে তাই তুমি পত্র পাওয়ামাত্র দ্রুত মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। যদি তুমি এই পত্র রাতে হাতে পাও তাহলে সকাল হওয়ার অপেক্ষা করবে না আর যদি সকালে পাও তাহলে রাতের জন্য অপেক্ষা করবে না। হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র প্রতি তাঁর ভালোবাসা খুবই প্রগাঢ় ছিল। হযরত আবু উবায়দা(রা.) সেই পত্র পড়ে বলেন, আমি আমিরুল মু'মিনীনের প্রয়োজন জানি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত উমরের প্রতি কৃপা করুন। আবু উবায়দা (রা.) মনে মনে ভাবলেন, তিনি (রা.) তাকে বাঁচাতে চান। এই মৃত্যুপথযাত্রী অর্থাৎ আমার সাথে কী হতে যাচ্ছে তা তো আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এরপর তিনি (তথা হযরত আবু উবায়দা) (রা.) উক্ত পত্রের উত্তরে লেখেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি আপনার অভিপ্রায় বুঝে গেছি, আমাকে অনুগ্রহ করে ডাকবেন না। আমাকে এখানেই থাকতে দিন কেননা আমি মুসলিম সৈনিকদের একজন। অদৃষ্টে যা আছে, তা-ই হবে। আমি তাদেরকে ছেড়ে কীভাবে যেতে পারি! হযরত উমর (রা.) সেই পত্র পাঠ করে কেঁদে ফেলেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! হযরত আবু উবায়দা কি পরলোক গমন করেছেন? তিনি (রা.) বললেন, না- তবে হয়তো তা-ই হবে।

(সিয়ার আলামুন নাবলা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮-১৯)

হযরত উমর (রা.) সুচিন্তাশীল সাহাবীদের পরামর্শক্রমে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে লিখে পাঠান যে, তুমি লোকদেরকে নিয়ে নিচু এলাকায় পৌঁছেছ তাই কোন উঁচু এবং স্বাস্থ্যকর এলাকায় চলে যাও। নিচু জায়গা পরিত্যাগ করে কোন উঁচু জায়গায় চলে যাও অর্থাৎ এমন পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানকার বাতাস হবে নির্মল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) উক্ত আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে কেবল ভাবছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁর ওপর প্লেগের আক্রমণ হয় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিজ স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত মুআয বিন জাবালকে মনোনীত করেন কিন্তু তিনিও প্লেগে আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) নিজ স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আমর বিন আস (রা.)-কে মনোনীত করেন। তিনি (তথা হযরত আমর বিন আস) একটি বক্তব্য রাখেন এবং বলেন, এই মহামারি যখন দেখা দেয় তখন আগুনের মত ছড়ায় তাই পাহাড়ে লুকিয়ে হলেও নিজেদের প্রাণ রক্ষা কর। তিনি লোকদের নিয়ে সেখান থেকে বের হন এবং পাহাড়ে চলে যান। ধীরে ধীরে মহামারির প্রকোপ কমে যায় এবং কমতে কমতে অবশেষে পূর্ণ রূপে নির্মূল হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) যখন হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর বক্তব্যের বিষয়ে জানতে পারেন তখন তিনি তা কেবল পছন্দই করেন নি বরং সেটি আবু উবায়দা (রা.)-কে প্রেরিত তাঁর নির্দেশের বাস্তবায়ন বলে আখ্যা দেন।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর ফারুক আযাম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, (উর্দু অনুবাদ), পৃ: ৪১৩)

আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) ছাড়াও হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.), হযরত হারিস বিন হিশাম (রা.) এবং হযরত সুহায়েল বিন আমর (রা.)ও হযরত উতবা বিন সুহায়েল (রা.) এবং আরও অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ সেই মহামারিতে মৃত্যুবরণ করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৭, দারুল কুতুবল ইলমিয়া, বেরুত)

আমওয়াসের প্লেগ থেকে ফেরত আসার উল্লেখ করতে গিয়ে একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, যখন সিরিয়ায় যুদ্ধ হয় এবং সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তখন হযরত উমর (রা.) স্বয়ং সেখানে যান যাতে করে লোকদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সৈন্যদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এ রোগের প্রকোপ যখন বেড়ে যায় তখন সাহাবীরা নিবেদন করেন, আপনার এখানে অবস্থান করা সমীচীন নয়, আপনি মদীনায় ফিরে যান। তিনি (রা.) যখন ফিরে যেতে মনোস্থির করলেন তখন হযরত আবু উবায়দা বলেন, ***আ ফিরারাম্ মিন কাদরিল্লাহ?*** আপনি কি আল্লাহ্‌র তকদীর থেকে পলায়ন করছেন? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, ***'না'আম, নাফিরুর মিন কাদরিল্লাহি ইলা কাদরিল্লাহ।'*** অর্থাৎ, হ্যাঁ, আমরা খোদার এক তকদীর হতে অন্য তকদীরের দিকে ধাবিত হচ্ছি। সর্বোপরি, জাগতিক উপকরণাদি পরিত্যাগ করা বৈধ নয়, (বরং) হ্যাঁ, জাগতিক উপকরণাদি ধর্মের অধীনেই রাখা উচিত।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ১০৪)

হযরত উমর (রা.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে। হযরত খাওওয়ায বিন জুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মানুষ কঠিন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। তখন হযরত উমর (রা.) লোকদের সাথে নিয়ে বের হন এবং তাদেরকে নিয়ে দু' রাকাত ইস্তিস্কার নামায আদায় করান। অতঃপর নিজের দু'কাঁধের ওপর চাদর রাখেন। চাদরের ডানদিক বাম কাঁধের ওপর এবং বামদিক ডান কাঁধের ওপর রাখেন তথা আবৃত করেন, এরপর তিনি দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত তুলেন এবং নিবেদন করেন, আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাগফিরুকা ওয়া নাসতাসকিকা। অর্থাৎ, হে মহাসম্মানিত আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং বৃষ্টি কামনা করি। তিনি দোয়া করে তখনও নিজের স্থান ত্যাগ করেন নি, ইতিমধ্যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের গ্রামের লোকেরা হযরত উমরের কাছে আসে এবং নিবেদন করে, হে আমীরুল মু'মিনীন! অমুক দিন অমুক সময় আমরা আমাদের উপত্যকায় ছিলাম। (হঠাৎ) আমাদের ওপর মেঘমালা ছায়া করল এবং আমরা সেটির মাঝ থেকে একটি ধ্বনি শুনতে পেলাম আর তা হল, আবু হাফস!এর বৃষ্টির মাধ্যমে তোমাদের কাছে সাহায্য এসেছে; আবু হাফস! বৃষ্টির মাধ্যমে তোমাদের কাছে সাহায্য এসেছে!

(কুনযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম ভাগ, হাদীস-২৩৫৩৩)

তাঁর (রা.) একটি দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনা রয়েছে যা নীলনদ প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। নীলনদ যখন শুকিয়ে যেতো তখন ইসলামের পূর্বে সেখানকার লোকদের মাঝে সেটির নাব্যতা বজায় রাখার একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। আর সেই প্রথার কোন প্রভাব পড়তো কিনা তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন কিন্তু ইসলাম সেই কদাচারের অবসান ঘটিয়েছে এবং সে প্রথার অবসান ঘটানোর যে ঘটনা বর্ণনা করা হয় তা হলো, কায়েস বিন হিজায বর্ণনা করেন, যখন মিশর বিজিত হয় তখন সেখানকার অধিবাসীরা ইরানী মাসের কোন একদিন হযরত আমর বিন আস (রা.)'র নিকট আসে। লোকেরা বলে, হে আমীর! আমাদের নীলনদের জন্য একটি প্রথা রয়েছে যা পালন না করলে এতে পানি প্রবাহিত হয় না। হযরত আমর জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কী? তারা বলল, যখন এই মাসের এগার রাত কেটে যায় তখন আমরা এক কুমারী মেয়ের নিকটে তার পিতামাতার উপস্থিতিতে যাই অতঃপর তার পিতামাকে সম্মত করাই এবং তাকে উত্তম পোশাক ও অলঙ্কারাদি পরিধান করাই তারপর তাকে নীলনদে ফেলে দিই। হযরত আমর তাদেরকে বললেন, ইসলামে এমনটি কখনও ঘটতে দেওয়া হবে না। নিশ্চয়ই ইসলাম এমন সব কুসংস্কার নির্মূল করে যা ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল।

সুতরাং তারা অপেক্ষমান রইল আর তখন নীলনদে তখন কোন নাব্যতা ছিল না এমনকি লোকেরা নিজ দেশ পরিত্যাগ করার জন্য মনোস্থির করল। অর্থাৎ প্রথমদিকেই তারা নিক্ষেপ করত। কিন্তু অবশেষে এমন সময় আসল যখন কিনা নীলনদ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেল আর লোকেরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার সংকল্প করল। অতএব, হযরত আমর (রা.) এহেন অবস্থা দেখে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে এবিষয়ে অবগত করলেন। হযরত উমর (রা.) উত্তরে হযরত আমর বিন্ আস (রা.)-কে লিখেন, তুমি যা বলেছো তা একেবারেই সঠিক।নিশ্চিতভাবে ইসলাম পূর্বের সকল কুসংস্কারকে নির্মূল করে। তিনি পত্রের সাথে একটি চিরকুট (লিখে) পাঠান এবং হযরত উমর (রা.), হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে লিখে পাঠান যে, আমি আমার পত্রে তোমার জন্য একটি চিরকুট

(লিখে) পাঠিয়েছি সেটি নীলনদে ভাসিয়ে দিও। হযরত উমর (রা.)'র পত্র হযরত আমর বিন আস (রা.)'র কাছে পৌঁছলে সেই চিরকুটটি যখন খুলেন তখন তাতে লেখা দেখেন, আল্লাহ্‌র বান্দা উমর ইবনুল খাত্তাব আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে মিশরের নীলনদের প্রতি। অতঃপর যদি তুমি নিজে থেকে প্রবাহিত হয়ে থাক তবে প্রবাহিত হয়ে না কিন্তু আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন তবে আমি মহা প্রতাপান্বিত এক আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি যেন তিনি তোমাকে প্রবাহিত করেন। সুতরাং, হযরত আমর (রা.) সেই চিরকুটিকে ক্রুশীয় উৎসবের এক দিন পূর্বে নীলনদে ফেলে দেন। (পরদিন) সকালে (দেখা যায়), মহান আল্লাহ্‌ এক রাতেই নীলনদে পূর্বের তুলনায় ষোল হাত বেশি পানি প্রবাহিত করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্‌ মিশরবাসীদের এই কুসংস্কারকে নির্মূল করে দেন।

(তারিখুল খোলাফা, প্রণেতা-জালালুদ্দিন আস সুইয়ুতি, উমর ইবনে খাত্তাব, পৃ: ১০০, দারুল কিতাবুল আরাবী, বেরুত, প্রকাশকাল: ১৯৯৯)

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থে যদিও এই ঘটনার সত্যায়ন দেখা যায় কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র একজন জীবনীকারক মুহাম্মদ হুসেইন হ্যায়কল এ ধারণাকে এই মর্মে প্রত্যাখ্যান করেন যে, এমন কোন প্রথাই ছিল না।

[সৈয়্যদানা হযরত উমর ফারুক আযাম, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, (উর্দু অনুবাদ), পৃ: ৬৭৩, ইসলামি কুতুব খানা, লাহোর]

যাহোক, এটি একটি ঘটনা।

এরপর রয়েছে হযরত সারিয়ার যুদ্ধে হযরত উমর (রা.)'র আওয়াজ শোনার ঘটনা। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, এখানেও কবুলিয়তে দোয়ার প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করছি এবং আল্লাহ্‌ তা'লার যে এক বিশেষ আচরণ ছিল (সেই প্রেক্ষাপটে)। তাবারীর ইতিহাস (গ্রন্থে) রয়েছে, হযরত উমর (রা.) হযরত সারিয়া বিন জুনায়েমকে ফাঁসা এবং দারা আবযার্দ অভিমুখে প্রেরণ প্রেরণ করেন।তিনি সেখানে পৌঁছে লোকদেরকে ঘিরে ফেলেন। তখন তারা নিজেদের সাহায্যের জন্য মিত্র বাহিনীকে আহ্বান জানালে তারা মুসলমান সেনাদের মোকাবিলার জন্য মরুভূমিতে সমবেত হয়। আর যখন তাদের সংখ্যা বেশি হয়ে যায় তখন তারা মুসলমানদেরকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলে। জুমআর দিন খুতবা দেয়ার সময় হযরত উমর (রা.) বলেন, হে সারিয়া বিন জুনায়েম আল জাবাল, আল জাবাল অর্থাৎ, হে সারিয়া বিন জুনায়েম পাহাড়, পাহাড়। মুসলমান সেনাদল যেখানে অবস্থান করছিল তার কাছেই একটি পাহাড় ছিল। তারা সেখানে আশ্রয় নিলে শত্রু কেবল এক দিক থেকেই আক্রমণ করতে পারত। সুতরাং, তারা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে জয় লাভ করেন আর অনেক মালে গণিমত লাভ করেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫৩-৫৫৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) এই ঘটনাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, সাহাবীদের এমন অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা প্রমাণিত।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৫৪, উপটিকা নং-৪)

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর পুরো উদ্ধৃতিটি গত খুতবায় আমি পাঠ করেছি। সুতরাং, নীলনদ প্রবাহিত হওয়া সংক্রান্ত ঘটনাটিও যদি আমরা দেখি তবে এই ঘটনাটি সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়, যদিও কিছু ঐতিহাসিক (এই ঘটনাকে) সঠিক বলে বিশ্বাস করে না।

হযরত উমর (রা.)'র টুপির কল্যাণ ও রোমান সম্রাট সম্পর্কিত একটি ঘটনা রয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে একবার রোমান সম্রাটের মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়, সকল প্রকার চিকিৎসা সত্ত্বেও আরোগ্য লাভ হয় নি। কেউ তাকে পরামর্শ দেয় যে, হযরত উমর (রা.)-কে নিজের অবস্থা লিখে পাঠান এবং তাঁর কাছ থেকে কোন তবাররুক চেয়ে পাঠান। তিনি আপনার জন্য দোয়াও করবেন এবং উপহারও পাঠিয়ে দেবেন আর তাঁর দোয়ার ফলে আপনি আরোগ্য লাভ করবেন। তিনি হযরত উমর (রা.)'র কাছে নিজের দূতকে প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) ভাবেন, এরা অহংকারী মানুষ। আমার কাছে এদের আশা অনেকটা অসম্ভব! এখন যেহেতু ব্যথায় জর্জরিত তাই সে তার দূতকে আমার কাছে প্রেরণ করেছে। আমি যদি তাকে অন্য কোন উপহার পাঠাই তাহলে সে এটিকে তুচ্ছ মনে করে হয়ত ব্যবহার করবে না। তাই আমার এমন কোন জিনিস পাঠানো উচিত যা তবাররুকের কাজও করবে এবং তার দর্পও চূর্ণ করবে। সুতরাং, তিনি বিভিন্ন জায়গায় দাগযুক্ত তাঁর একটি পুরোনো টুপি, যা ময়লার কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল সেটি তবাররুক হিসেবে প্রেরণ করেন। এ টুপি দেখার পর সে খুব অপমান বোধ করে, তাই সে আর টুপিটি পরে নি। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লা বলতে চাচ্ছিলেন, এখন তুমি কেবল মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমেই কল্যাণ লাভ করতে পার। তার মাথায় এত তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল যে, সে তার চাকরবাকরকে বলে, উমর যে টুপিটি পাঠিয়েছে সেটি নিয়ে আসো যেন আমি তা মাথায় দিতে পারি। অতএব, সে টুপি পরিধান করে আর তার ব্যথা কমতে শুরু করে। যেহেতু প্রতি অষ্টম বা দশম দিনেই মাথা ব্যথা হত এজন্য এটি তার রীতি হয়ে যায় যে, সে যখনই দরবারে বসত তখন সে তার মাথায় হযরত উমর (রা.)-এর সেই ময়লা ও অপরিপাটি টুপিটিই পরে বসতো।হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'লা তাকে যে এই নিদর্শন দেখিয়েছেন তাতে আরেকটি বিষয়ও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর এক সাহাবী সিজার বা রোমান সম্রাটের কাছে বন্দি ছিলেন আর সে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল যে তাঁকে যেন শুকরের মাংস খাওয়ানো হয়। তিনি ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতেন কিন্তু শুকরের কাছেও যেতেন না। যদিও ইসলাম অনুসারে, নিরুপায় অবস্থায় শুকরের মাংস খাওয়া বৈধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, আমি [মহানবী (সা.)-এর] সাহাবী, তাই আমি এমনটি করতে পারি না। বেশ কয়েক দিন ক্ষুধার্ত থেকে মৃত্যুর দারপ্রান্তে পৌঁছে গেলে তখন সিজার তাকে রুটি দিত। তার গায়ে আবার কিছুটা শক্তি ফিরে এলে পুনরায় সে তাঁকে শুকর খাওয়াতে বলত। এভাবে সে তাকে মরতেও দিতো না আর (ভালোভাবে) বাঁচতেও দিত না। তখন কেউ তাকে বলে, তোমার মাথা ব্যথার কারণ হলো, তুমি এই মুসলমানকে বন্দি করে রেখেছ আর এখন তোমার একমাত্র চিকিৎসা হলো, উমরকে দিয়ে নিজের জন্য দোয়া করাও এবং তার কাছ থেকে কোন উপহার চেয়ে পাঠাও। যখন হযরত উমর (রা.) তার জন্য টুপি প্রেরণ করেন আর তার ব্যথা ভালো হয়ে যায় তখন সে এতে এতটাই প্রভাবিত হয় যে, সে সেই সাহাবীকেও মুক্ত করে দেয়। এখন দেখো! সিজার এক সাহাবীকে কষ্ট দেয় আর আল্লাহ্‌ তা'লা এর শাস্তিস্বরূপ তার মাথায় ব্যথা সৃষ্টি করে দেন। তখন অন্য এক ব্যাক্তি তাকে পরামর্শ দেয়, উমরের কাছে উপহার চেয়ে পাঠাও আর তাকে দিয়ে দোয়া করাও। তিনি উপহার প্রেরণ করেন এবং সিজারের ব্যথা দূর হয়ে যায়। অতএব এভাবেই আল্লাহ্‌ তা'লা সেই সাহাবীর মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং তার কাছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সত্যতা প্রকাশ করে দেন।

(সেইরে রূহানী, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৫৩৬-৫৩৭)

তফসীর রাযীতে রয়েছে, সিজার হযরত উমর (রা.)-কে লিখে, আমার মাথাব্যথা রয়েছে আর তা ভালো হচ্ছে না, আপনি আমার জন্য কোন ঔষধ প্রেরণ করুন। তখন হযরত উমর (রা.) তার জন্য একটি টুপি প্রেরণ করেন। সেটি মাথায় দিতেই তার মাথাব্যথা কমে যেত, কিন্তু যখনই সে তা মাথা থেকে খুলে ফেলত পুনরায় তার মাথাব্যথা শুরু হয়ে যেত। এতে সে বিস্মিত হয় আর টুপিতে একটি কাগজ খুঁজে পায় যাতে 'বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম' লেখা ছিল। এটি তফসীরে রাযীর একটি উক্তি।

(তফসীর কবীর লি ইমাম রাজি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

হযরত উমর (রা.)'র কতিপয় দোয়া রয়েছে। আমর বিন মায়মুন বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) দোয়া করতেন, اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنِيْ مَعَ الْأَبْرَارِ وَلَا تُخَلِّفْنِيْ فِي الْأَشْرَارِ وَقِنِيْ عَذَابَ النَّارِ وَأَلْحِقْنِيْ بِالْأَخْيَارِ অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে পুণ্যবানদের সাথে মৃত্যু দাও, আর পেছনে মন্দ লোকদের মাঝে আমাকে রেখে দিও না এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা কর আর আমাকে পুণ্যবানদের সাথে যুক্ত কর।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৭)

ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মীনা থেকে ফেরার পর তাঁর উটকে কঙ্করময় ময়দানে বসান এবং মক্কার উপত্যকার পাথর দিয়ে একটি স্তুপ বানান আর এর ওপর তার চাদরের এক প্রান্ত বিছিয়ে শুয়ে পড়েন এবং নিজের হাত (দু'টি) আকাশ পানে তুলে দোয়া করেন- اَللّٰهُمَّ كَبُرَتْ سِنِّيْ وَضَعُفَتْ قُوَّتِيْ وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِيْ فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্‌! আমার বয়স হয়েছে, আমার শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে এবং আমার প্রজারা ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি আমাকে বিনষ্ট না করে বা কম না করে মৃত্যু দাও। এরপর যিলহজ মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর ওপর আক্রমণ হয় আর তিনি শাহাদত বরণ করেন ।

(উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬২, উমর ইবনুল খাত্তাব)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর (রা.) একটি নতুন কাজ করেন যা তিনি সাধারণত করতেন না আর তা হলো, তিনি লোকদের এশার নামায পড়িয়ে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতেন এবং সারা রাত ক্রমাগত (নফল) নামায পড়তেন। এরপর তিনি বাইরে বের হতেন এবং মদীনার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতেন। এক রাতে সেহ্‌রীর

এরপর ৯এর পাতায়....

প্রশ্ন: ইয়াজুজ ও মাজুজ কারা?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন-

শেষযুগে ইসলাম সম্পর্কে যে সব বিপদাপদ ও নৈরাজ্যের সম্মুখীন হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সেগুলির মধ্যে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ একই ফিতনার দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ। দাজ্জাল হল এই ফিতনার ধর্মীয় রূপটির নাম। যার অর্থ হল এই দলটি শেষ যুগে মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং চিন্তাধারার মাঝে বিকৃতি তৈরী করবে। আর সেই যুগে যে দলটি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি ধ্বংস করবে, সেটিকে ইয়াজুজ মাজুজ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

উভয় দল বলতে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান জাতিসমূহের জাগতিক ও রাজনৈতিক শক্তি এবং তাদের ধর্মীয় দিকটিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই সংবাদও দিয়েছেন যে যখন দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ আত্মপ্রকাশ করবে এবং ইসলাম শক্তিহীন হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত মসীহকে প্রেরণ করবেন। সেই সময় মুসলমানদের কাছে জাগতিক শক্তি থাকবে না, কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহর জামাত দোয়া এবং প্রচারের মাধ্যমে কাজ করে যাবে। যার পরিণামে আল্লাহ তা'লা সেই সব নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবেন।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, হুযুর (সা.) কি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে স্বপ্নে দেখেছিলেন? এর উত্তর হাদীসে পাওয়া যায় যে হুযুর (সা.) আগমণকারী মসীহকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। সহীহ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হুযুর (সা.) বলেছেন, রাত্রিতে আমি স্বপ্নে নিজেকে খানা কাবার কাছে দেখতে পাই। সেখানে আমি গোধুম বর্ণের ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যেমনটি তোমরা উৎকৃষ্ট গোধুম বর্ণের মানুষ দেখে থাক, তার থেকেও সুদর্শন। তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়ছিল। তাঁর মাথা থেকে পানিবিন্দু চুঁইয়ে পড়ছিল। সে দুই ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহ্‌র তোয়াফ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ব্যক্তি কে?' লোকেরা বলল, মসীহ ইবনে মরিয়ম। এরপর তার পিছনে আমি আর এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যার কোঁকড়ানো চুল ছিল এবং ডানচক্ষু ছিল দৃষ্টিহীন। এবং ইবনে কুতান (একজন কাফের)=এর সঙ্গে যার অনেক সাদৃশ্য ছিল। সে এক ব্যক্তির দুই কাঁধে ভর করে বায়তুল্লাহ্‌কে প্রদক্ষিণ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ব্যক্তি কে?' আমি উত্তর পেলাম, 'এ হল মসীহ্-র দাজ্জাল'।

অনুরূপভাবে সহীহ বুখারীর অপর এক রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা.) বলেন, (মেরাজের রাত্রিতে) আমি ঈসা (আ.) এবং ইব্রাহিম (আ.)কে দেখেছি। ঈসা ছিলেন লাল রঙের, কোঁকড়ানো চুল এবং প্রশস্ত কাঁধ বিশিষ্ট। আর মূসা ছিলেন গোধুমী বর্ণের, হৃষ্টপুষ্ট সোজা কেশগুচ্ছ সম্পন্ন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি (যুত গোত্রের) সদস্য।

এই দুটি হাদীসে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের কথা বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, হুযুর (সা.) মুসীয় মসীহ হযরত ঈসা (আ.)কেও দেখেছেন, কিন্তু তাঁকে মৃত আম্বিয়া হযরত মূসা এবং এবং হযরত ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখেছেন। এবং নিজের আধ্যাত্মিক পুত্র একনিষ্ঠ দাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কেও দেখেছেন, দাজ্জালের যুগে আবির্ভূত হয়ে যাঁর মোকাবেলা করে ইসলামকে রক্ষা করার কথা ছিল এবং তাঁকে তিনি তোয়াফ করতে দেখেছেন।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ২৩ শে আগস্ট হল্যাণ্ডের নও মোবাইন ছাত্রীদের সঙ্গে হুযুরের অনলাইন সাক্ষাতের সময় একজন ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, তারা অনলাইনে একটি কুর্দী গ্রুপে তবলীগ করছে, যে গ্রুপে পাকিস্তান থেকে শিক্ষার্জনকারী কিছু মোল্লাও রয়েছে। যদি এই গ্রুপের সদস্যরা আমাদের কথা শোনার সময় সততা ও বিশ্বস্ততা না দেখায়, তবুও কি আমরা তবলীগ করতে থাকবে কি না? হুযুর আনোয়ার (আই.) এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন-

কেউ যদি শুধু অহেতুক বিতর্ক করে যায়, তবে তাতে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে ভাল হবে কিছু ভাল মানুষের সঙ্গে কথা বলা, তাদেরকে তবলীগ করা, যারা আপনার কথা শুনবে। যারা হঠকারিতা করে, শুধু তর্ক করে, ক্রমাগত আপত্তি করে চলে, যুক্তিসঙ্গত কোন কথা বলে না, তাদের পেছনে সময় নষ্ট করার দরকারই বা কি? যদি তাদের উদ্দেশ্য সৎ হয়, কথা শুনতে আগ্রহী হয়, নৈতিকতার মধ্যে থেকে কথা বলতে চায়, তবে তারা স্বাগত, তাদের সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু যদি তারা অসঙ্গত কথাবার্তা বলে, তবে তাকে ছেড়ে দিন, অন্য কাউকে দেখুন, যারা ভদ্রভাবে কথা বলতে পারে, যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারে, এবং আপনার যুক্তিও শোনে। এবং ন্যায়পূর্ণভাবে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে এবং দেখে যে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা।

প্রশ্ন: সেই অনুষ্ঠানেই এক ছাত্রী প্রশ্ন করে যে আপনার পিতামাতার কোন উপদেশ আপনার সব থেকে বেশি কাজে এসেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, কখনও মিথ্যা কথা বলবে না- এই উপদেশটি।

প্রশ্ন: এক ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে একটি সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোরোনা ভাইরাসের কারণে বড় বড় গার্মমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে শ্রমিকদেরকে পুরো প্রাপ্য দিচ্ছে না। অধিকাংশ লোকের বক্তব্য, এই সব ব্রান্ড গুলোর বয়কট হওয়া উচিত। হুযুর আনোয়ার এ সম্পর্কে কি বলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন-

প্রশ্ন হল, এখানকার যে সব বড় বড় কোম্পানি রয়েছে, তারা তো টাকা দিয়ে দেয়। কেননা, তারা শ্রমিক বা কর্মীদের কাছে সরাসরি যায় না। সেখানকার কিছু মানুষ এর জন্য ঠিকা নিয়ে নেয়, তারা পরে ঠিকাতে কাজ করতে দেয়। অর্থাৎ বড় কোম্পানি গুলি ঠিকা দেয় আর ঠিকাদাররা স্থানীয় শ্রমিকদেরকে নিয়ে কাজ করে। তারা যদি সঠিকভাবে পারিশ্রমিক না দেয়, তবে তারা তাদেরকে শোষন করছে। তাই এটা সেই দেশের মানুষের দোষ। কোম্পানিগুলির ততটা দোষ নেই। কেননা সাধারণত এটাই দেখা যায় যে, এরা টাকা দিয়ে দেয়। তবে কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যারা দেয় না। তাদের বড় বড় ব্যবসা চলছে,কারণ ন্যায্যভাবে ব্যবসা করছে, আর যতটুকু পারশ্রমিক ধার্য হয়েছে তা ন্যায্যভাবে দেয়।

তবে একথা ঠিক যে, পারশ্রমিক কম দেয়। আর এটাও ভিন্ন কথা যে তারা বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভারত বা পাকিস্তানের মত দরিদ্র দেশে কাজ করায়। কারণ এই দেশগুলিতে কম পারিশ্রমিকে কাজ হবে। কিন্তু যতটুকু পারিশ্রমিক ধার্য হয় তা তারা দিয়ে দেয়।

পরে যে সব ঠিকাদার যে সব সহ ঠিকাদারদেরকে ঠিকা দেয় আর তারা যে পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ করায় তা এক প্রকার প্রবঞ্চনা। তাই বয়কট করে লাভ কি? যে সামান্য উপার্জনটুকু তারা করছে, সেটুকুও হারাবে। আর সংশ্লিষ্ট দেশের যে আইন রয়েছে, বাংলাদেশ বা যে দেশে এই অনৈতিক কাজ হচ্ছে, সেখানকার আইন ব্যবস্থার উচিত শ্রমিকদের বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং মধ্যস্থাতাকারীদের কাছ থেকে তাদেরকে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাইয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন: কোনও অনলাইন ব্যবস্থাপনার অধীনে কি তারাবিহর নামায পড়া যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি মসজিদ এবং তার পিছনে বাড়ি একই স্থানে থাকে, যেমনটি যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদে মসজিদ মুবারক এবং এর পিছনে কর্মী আবাসন রয়েছে, সেক্ষেত্রে লাউড স্পীকার এবং এফ.এম রেডিও ইত্যাদি নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে কেবল অপারগতার ক্ষেত্রে তারাবিহ্ ও অন্যান্য নামায পড়া যায়, যেমন বর্তমানে কোরোনা ভাইরাস জনিত মহামারির কারণে মানুষ নিরুপায়। কিন্তু যদি মসজিদ এবং বাড়ি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হয় বা বাড়িগুলি মসজিদের সম্মুখভাগে অবস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে সেই সব বাড়ির বাসিন্দারা মসজিদে হওয়া নামাযের নেতৃত্বে নামায পড়তে পারবে না, তারা নিজের নিজের বাড়িতে বা-জামাত নামায পড়তে পারে।

প্রশ্ন: বর্তমানকালে অপারগতার কারণে মানুষ যখন বাড়িতে বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা করছে, সেখানে কি মেয়েরা নামাযের জন্য ইকামত দিতে পারে বা ইমাম ভুলে গেলে ভুল ধরিয়ে দিতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি কেবল বাড়ির পুরুষ ও মহিলারা থাকে ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু যদি বাইরের পুরুষ থাকে তবে হুযুর (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে কোনও ভুল হলে মহিলারা হাততালি দিবে। ভুল ধরানোর জন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করবে না বা সুবহানাল্লাহ্ বলবে না।

তিনি আরও বলেন, বাড়িতে নামায হলেও মেয়েরা ইকামত বলবে না। কেননা হুযুর (সা.)-এর অনুমতি প্রদান করেন নি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে যে তিনি যখন কোন অপারগতার কারণে বাড়িতে নামায পড়তেন এবং হযরত আম্মা জান (রা.) কে নামাযে সঙ্গে দাঁড় করাতেন (হযরত আম্মা জান তাঁকে সঙ্গে দাঁড় করানোর অপারগতার কথাও বর্ণনা করেছেন) কিন্তু কোথাও একথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত আম্মা জানকে কখনও ইকামত বলার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, পুরুষরা নিজেরাই ইকামত বলবে আর এমনিতেও ইকামত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনে ইমাম নিজেও ইকামত বলতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর বর্ণনায় যে হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেটি সুনান তিরমিযিতে আমর বিন উসমান বিন ইয়ালি বিন মাররাহ্ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যিনি তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা (ইয়ালি বিন মাররাহ)-র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে সফর করছিলেন। তাঁরা এক সংকীর্ণ স্থানে পৌঁছলেন আর সেখানে নামাযের সময় হল। সেখানে উপর থেকে বৃষ্টি পড়ছিল আর নীচের মাটি কর্দমাক্ত ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজের বাহনে বসে আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। অতঃপর তিনি নিজের বাহনকে সামনে রাখেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে নামায পড়ান। তিনি সিজদায় রুকুর থেকে বেশি ঝুঁকে পড়ছিলেন।

(জামে তিরমিযি, কিতাবুস সালাত, বাব মা জাআ ফিসসালাত)

আরবদেশ থেকে এক ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ারকে লেখেন যে, 'মিলিকে ইয়ামিন' বলতে কি বোঝায়? তিনি এও প্রশ্ন করেন যে, তালাকের সঠিক শর্তাবলী কি কি এবং একবার মৌখিক তালাক উচ্চারণ করলে তালাক কার্যকরী হওয়ার বিষয়ে কি নির্দেশ রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন,- 'ইসলামের প্রাথমিক যুগে শত্রুরা যখন মুসলমানদেরকে নানাভাবে অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করত, সেই সময় কোন হতদরিদ্র ও নিপীড়িত মুসলমান মহিলা যদি তাদের হাতে আসত, তবে তারা তাকে দাসী ও রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করত। ইসলামের শত্রুপক্ষের মহিলারা, যারা আক্রমণকারী সেনাদলকে সাহায্য করতে সঙ্গে আসত, সেই যুগের রীতি অনুসারে সেই সব মহিলাদেরকে বন্দী বানানো হত। পরবর্তীতে শত্রুপক্ষের এই সব মহিলারা মুক্তিপণ দিয়ে বা চুক্তির মাধ্যমেও যখন স্বাধীন হতে পারত না, আর যেহেতু সেই যুগে যুদ্ধবন্দীদের আটক রাখার জন্য কারাগার ছিল না, সেই কারণে তাদেরকে সেনাযোদ্ধাদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হত। جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا। ইসলামি পরিভাষায় এই সব মহিলাদেরকে 'মিলকে ইয়াইমান' (ডান হাতের সম্পদ) বলা হয়।

এছাড়াও 'মিলকে ইয়াইমান' এর বিষয়ে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই মহিলার যুদ্ধাঙ্গণে এসেছে তাই শত্রুপক্ষের মহিলাদের ধরে এনে দাসী বানিয়ে নিবে- ইসলাম কখনই এর অনুমতি দেয় না, বরং ইসলামের শিক্ষা হল, যতক্ষণ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ কাউকে কয়েদী বানানো যাবে না। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ কোন নবীর পক্ষে ইহা সমীচীন হনে যে, সে কোন যুদ্ধ-বন্দী রাখে যদি না সেদেশে নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (যদি তোমরা নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যতিরেকে যুদ্ধ-বন্দী রাখ সেক্ষেত্রে) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করিতেছ (বলিয়া সাব্যস্ত হইবে) এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাহিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আনফাল: ৬৮)

এখানে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শর্ত যুক্ত হয়েছে, ফলে যুদ্ধের ময়দানে কেবল সেই সব মহিলাদেরকেই কয়েদী হিসেবে ধরা হত, যারা যুদ্ধের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকত। এই জন্য তারা কেবল মহিলা ছিল না, প্রতিপক্ষ তথা শত্রু হিসেবে সেখানে আসত।

কাজেই ইসলাম এই সব মহিলাদেরকে মোটেই দাসী বা রক্ষিতা বানানোর পক্ষপাতী নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে এর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় তাদেরকে মুক্ত করতে উৎসাহিত করেছেন। আর যতদিন পর্যন্ত তারা নিজেরা স্বাধীনতা লাভ না করত বা তাদেরকে মুক্ত না করা হত, ততদিন তাদের সঙ্গে কৃপাসুলভ আচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন।

(ক্রমশ.....)

১ম পাতার পর.....

কি প্রাণীজাত খাদ্য নয়? আর যারা মায়ের দুধ খায় না,তারা অন্য কোন পশুর দুধ খায়। সেটিও প্রাণীজ খাদ্য। আর যারা বাহ্যত প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণে অস্বীকার করে, তারা পরিণত বয়সেও ঘি এবং দুধ ব্যবহার করে, যেগুলি প্রাণীজাত খাদ্য। তাই এমন ব্যক্তি কেউ নেই যার প্রধান খাদ্য প্রাণীজ নয়। যারা নিজেদেরকে নিরামিষভোজী বলে দাবি করে, তারা হয় নিজেরাই প্রবঞ্চনার শিকার কিম্বা জেনেশুনে অন্যদের সঙ্গে তঞ্চকতা করছে। তারা দাবি করতে পারে যে তারা মাংস খায় না, কিন্তু একথা বলতে পারে না প্রাণীজ খাদ্য ব্যবহার করে না।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ খাদ্য সংক্রান্ত বর্ণনার শেষে বলা হয়েছে যে, এর মাঝে চিন্তাশীল মানুষদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানব মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে খাদ্য দ্বারা। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মস্তিষ্ক আধ্যাত্মিক খাদ্য দ্বারা বিকশিত হয়। দ্বিতীয়ত এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে মানুষের স্বভাবের মধ্যে চিন্তা-চেতনা রয়েছে, কিন্তু তা বিকশিত করতে হলেও আধ্যাত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন। মানুষ একই প্রকারের হয়ে থাকে। কিন্তু একজনের চিন্তা করার শক্তি উন্নত মানের, কিন্তু অন্যজনের তা নয়। এর কারণ এটিই যে, একজন উপযুক্ত খাদ্য পায় আর অন্যজন পায় না। আধ্যাত্মিক জগতেও এই একই নিয়ম ক্রিয়াশীল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসার প্রেরণা বিদ্যমান, কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্য লাভকারী ব্যক্তির চিন্তাশক্তি ঐশী জ্যোতি লাভ করে, অন্যজন তা থেকে বঞ্চিত থাকে। (তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

৭ পাতার পর খুতবার শেষাংশ.....

সময় আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি, "আল্লাহুম্মা লা তাজআল হালাকা উম্মাতে মুহাম্মাদিন আলা ইয়াদাই" অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! আমার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বর্ণনা করেন, মানুষের উচিত নিষ্ঠার সাথে স্বীয় খোদা তা'লার ইবাদত করা। লোকেরা একে মন্দ বলুক বা ভালো সেটির তোয়াক্কা করা উচিত নয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ বাহ্যিক অবস্থাকে খারাপ করা মহানবী (সা.)-এর শেখানো এ দোয়া থেকে অবৈধ প্রমাণিত হয় আর সে দোয়াটি মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.) কে শিখিয়েছিলেন। সেই দোয়াটি হচ্ছে اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমার অভ্যন্তরকে বাহ্যিক অবস্থা অপেক্ষা উত্তম বানাও আর আমার বাহ্যিক অবস্থাকেও উত্তম বানাও।"

(হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮২)

মসজিদে নববী এবং নামাযের সম্মানের বিষয়ে হযরত উমর (রা.)'র যত্নবান থাকা সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত সায়েব বিন ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন আমি মসজিদে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে লক্ষ্য করে নুড়ি পাথর ছুড়ে মারেন। আমি তাঁর দিকে তাঁকিয়ে দেখি তিনি ছিলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)। তিনি বলেন, যাও! আর এ দু'জনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। দু'জন লোক উঁচুস্বরে কথা বলছিল। আমি তাদের দু'জনকে নিয়ে এলে হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমাদের দু'জনের পরিচয় কী অথবা বলেন, তোমরা কোথাকার লোক? উত্তরে তারা বলে, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমরা যদি এ শহরের বাসিন্দা হতে তবে আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম। তোমরা মহানবী (সা.)-এর মসজিদে উচ্চঃস্বরে কথা বলছো?

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪৭০)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র রীতি ছিল, (নামাযের) সারিগুলো সোজা না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহু আকবর বলতেন না। বরং সারিগুলো সোজা করার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। আবু উসমান নাহ্দী বলেন, আমি হযরত উমর (রা.)-কে দেখেছি, নামাযের জন্য যখন একামত হত তখন তিনি কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে, অর্থাৎ লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, হে অমুক! সামনে আসো আর হে তমুক! পিছনে যাও, অর্থাৎ সারিগুলো সোজা করতেন। তোমরা তোমাদের সারিগুলো সোজা রাখ। সারিগুলো সোজা হয়ে গেলে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবর বলতেন।

(সীরাত উমর ইবনুল খাত্তাব, প্রণেতা- ইবনুল জাওজি, পৃ: ১৬৫)

হযরত উমর (রা.)-এর আর্থি ক কুরবানী এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। এছাড় আরো অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন এবং তিনি এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর কাছে পরামর্শ করতে আসেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি খায়বারে জমি পেয়েছি। আমার দৃষ্টিতে ইতিপূর্বে কখনোই আমি এর চেয়ে উত্তম সম্পদ লাভ করি নি। এ সম্পর্কে আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন? তিনি (সা.) বলেন, তুমি চাইলে মূল জমি ওয়াক্ফ করে দাও এবং তার আয় দরিদ্রদের পেছনে ব্যয় কর। নাফে' বলতেন, এরপর হযরত উমর (রা.) সেই জমি এ শর্তে সদকা করে দেন যে, সেটি যেন বিক্রয় করা না হয় বা কাউকে দান করা না হয় অথবা উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও বন্টন করা না হয়। তিনি সেই জমি অভাবী ও আত্মীয়স্বজনের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, আল্লাহ্র পথে এবং মুসাফির ও অতিথিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। এছাড়া যে এই জমির তত্ত্বধায়ক হবে তার জন্য দোষের কিছু নেই যদি সে সেখান থেকে বিধি মোতাবেক কিছু খায় এবং (অন্যকে) খাওয়ায়; কিন্তু সম্পদ জমা করতে পারবে না।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুশ শারুত, হাদীস-২৭৩৭)

সুযোগ পেলেই হযরত উমর (রা.) অগ্রগামী হয়ে কুরবানী করার চেষ্টা করেছেন। আর সেটিও একটি সুযোগ ছিল যখন মহানবী (সা.) ধনসম্পদ কুরবানীর জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে উপস্থিত হন। পূর্বেও এ ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু তাঁর খোদাভীতির চিত্র হলো, মৃত্যুর সময় তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ছিল আর তিনি বলছিলেন, 'আমি কোন পুরস্কারের যোগ্য নই। আমি শুধু এতটুকু জানি যে, আমি যেন শাস্তি থেকে রক্ষা পাই। (খুতবাতে মাহমুদ, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৪)

এমনই ছিল তাঁর খোদাভীতির অবস্থা। যাহোক, এখনও অল্প কিছু কথা বাকি রয়ে গেছে যা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

****

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন মজীদের রক্ষক

-মৌলানা মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিণ ভারত

(২য় পর্ব.., পূর্ববর্তী সংখ্যা ৪৭-এর পর)

আর বুকের মধ্যে সংরক্ষিত থাকা কুরআন মজীদ পড়ার সময় কোথাও কোন তারতম্য হয় না। এটি আল্লাহ্ তা'লার সেই প্রতিশ্রুতির সব থেকে বড় প্রমাণ ও সত্যতা। বিগত চৌদ্দশ বছরে কুরআন করীম বুকের মধ্যে প্রজন্ম পরম্পরায় সংরক্ষিত হয়ে আসছে, অন্য কোনও গ্রন্থের ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কুরআন মজীদ সংরক্ষণ করার এই ব্যবস্থাপনাকে উপেক্ষা করে কোন আপত্তি করা যারপরনায় অজ্ঞতার প্রমাণ বলেই গণ্য হবে।

কুরআন মজীদ হিফাজতের দ্বিতীয় পদ্ধতি।

আঁ হযরত (সা.)-এর রীতি ছিল যে, কুরআন শরীফের যে আয়াতটি নাযেল হত, সেগুলিকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়ে দিতেন এবং খোদা তা'লা তাঁকে যেভাবে বোঝাতেন, সেই অনুসারে সেগুলিকে তিনিও নিজেও ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে নিতেন। এ বিষয়েও অনেক হাদীস রয়েছে। নীচের হাদীসটি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّان رضى الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نَزَلَ عليه شيئٌ دَعَا بَعْضَ مَن كَانَ يَكْتُبُ فيقول ضَعوا هٰؤُلاَءِ الاٰيات فى سو رة الَّتى يَذْ كُرُ فيها كَذَاوَ كَذَا فَاِذَا نَزَلَتْ عَلَيْه الاٰيةُ فَيَقُولُ ضَعُوا هذهِ الاٰية فى السُورة الّتى يذ كر فيها كذاوَ كذا

অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর চাচাতো ভাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.) খলীফা সালিস (যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর ওহীকে লিপিবদ্ধ করতেন) বলতেন, আঁ হযরত (সা.) -এর উপর যখন একাধিক আয়াত একত্রে নাযেল হত, তখন তিনি ওহী লেখকদের মধ্য থেকে কাউকে ডেকে বলতেন এই আয়াতগুলিকে অমুক সূরার অমুক স্থানে লিখে নাও আর যদি একটি মাত্র আয়াত নাযিল হত, তবে ঠিক সেই ভাবেই কোন ওহী লেখককে ডেকে এবং লেখার জায়গা বলে দিয়ে তাকে লিখিয়ে দিতেন।

যে সব সাহাবাদের দ্বারা ওহী লেখনীর কাজ নেওয়া হত তাঁদের নাম ও জীবনি বিস্তারিতভাবে ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে।তাঁদের মধ্য থেকে বেশি পরিচিত সাহাবারা হলেন হযরত আবু বাকার (রা.), হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলি, হযরত যুবায়ের বিন আল আওয়াম, হযরত শারজিল বিন হাসনা, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওহা, হযরত আবি বিন কাআব এবং হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাজিউল্লাহ্ আনহুম আজমাঈন।

(ফতহুল বারি, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৯)

এই তালিকা থেকে স্পষ্ট যে, আঁ হযরত (সা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই কুরআনের ওহী লিপিবদ্ধ করার জন্য এক বিশ্বস্ত জামাত পেয়েছিলেন। এই ভাবে কুরআন শরীফ কেবল যে লিপিবদ্ধ হতে থেকেছে তাই নয়, বরং সেই সঙ্গে এর বর্তমান ক্রমও নির্দিষ্ট হতে থেকেছে, যা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে নাযেল হওয়ার ক্রম থেকে ভিন্ন রাখা হয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পর, যখন কিনা কুরআন করীম নাযেল হওয়া পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখন হযরত আবু বাকার (রা.) খলীফা আওয়াল হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শে আঁ হযরত (সা.)এর ওহী লেখক হযরত যায়েদ বিন সাবিত আনসারি (রা.) কে নির্দেশ দেন কুরআন করীমকে গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত করতে। নির্দেশ পেয়ে হযরত যায়েদ বিন সাবিত অনেক পরিশ্রম করে প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে মৌখিক এবং লিখিত, উভয় প্রকারের পোক্ত সাক্ষী জোগাড় করে সেগুলিকে একটি গ্রন্থের রূপে একত্রিত করেন।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলুল কুরআন, বাব জামউল কুরআন, ফতহুল বারি, ৯ম খণ্ড,প পৃ: ১৭-১৮)

এরপর ইসলাম যখন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন হযরত উসমান খলীফা সালিস (রা.)-এর নির্দেশক্রমে যায়েদ বিন সাবিত (রা.)এর একত্রিত করা পুস্তক অনুসারে কুরআন শরীফের বহু অনুলিপি তৈরী করে সমস্ত ইসলামী দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলুল কুরআন, বাব জামউল কুরআন, ফতহুল বারি, ৯ম খণ্ড,প পৃ: ১৭-১৮)

সংরক্ষণের এই দ্বিতীয় পদ্ধতির পর নিন্দুকদের আপত্তির অসারতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। আর কুরআন করীম পরবর্তীকালে তৈরী করা হয়েছে - এমন দাবি করা অত্যন্ত আশ্চর্যের এবং অজ্ঞনতার প্রমাণ। আপত্তিকারীদের জানা থাকা উচিত যে, 'কিতাব' শব্দটি 'কাতাবা' ধাতু থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ্ তা'লা সূরা বাকারার প্রথমেই কুরআন পাঠকারীদেরকে এই সুসংবাদ শুনিয়েছেন যে, এটি সেই কিতাব। নিন্দুকদের উচিত 'কিতাব' শব্দটি প্রণিধান করা। এই গ্রন্থটি যদি সৈয়্যদানা মহম্মদ (সা.)-এর যুগে লিখিত আকারে না থাকত, তবে সেই যুগে মদিনায় বসবাসকারী মুনাফিক এবং বিরোধীরা প্রশ্ন তুলত যে, যে-ঐশী বাণীকে কিতাব বলা হচ্ছে সেটি কোথায়? সেটিকে আমরা তো গ্রন্থরূপে দেখছি না! তাদের নীরবতাই বলে দিচ্ছে যে, সেই যুগের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে কুরআন করীম লিখিত আকারে বিদ্যমান ছিল। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে ঘোষণা দিচ্ছেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হে কুরআন পাঠকারীরা, এটিকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে পড় এবং প্রণিধান কর। এই সকল সম্ভাব্য আপত্তির উত্তর আল্লাহ তা'লা প্রারম্ভিক দুটি শব্দের মাধ্যমেই দিয়ে রেখেছেন।

জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে কুরআনের হিফাযত

কুরআন মজীদ সংরক্ষণের বিষয়ে এবং চূড়ান্ত সতর্কতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে আল্লাহ্ তা'লা আরও একটি পন্থা অবলম্বন করেছেন। সেটি এই যে, প্রতি রমযান মাসে যতটুকু কুরআন মজীদ নাযেল হত, হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং সৈয়্যদানা মহম্মদ (সা.) তার পুনরাবৃত্তি করতেন। হুযুর (সা.)-এর জীবনের শেষ বছরে দুজনে এটি দুই বার পুনরাবৃত্তি করেন। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত ফাতেমা (রা.) বলেছেন,' নবী করীম (সা.) আমার কানে কানে একথা বলেছেন যে, প্রতি বছর জিবরাঈল আমার সঙ্গে কুরআন করীম এক বার পড়ে শেষ করতেন, কিন্তু এবছর দুই বার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এর থেকে আমি অনুধাবন করেছি যে আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে।

إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِى الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارَضَنِى الْعَامَ مَرَّتَيْنِ

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুযুর (সা.) তাঁর মৃত্যুশয্যায় নিজ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) কে বলেন, 'জিবরাঈল প্রতি বছর আমার সঙ্গে একবার কুরআন করীম পুনরাবৃত্তি করতেন, কিন্তু এবছর তিনি দুইবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।'

(সহী বুখারী, কিতাবুত তফসীর)

এই ঐশী ব্যবস্থাপনার পর কুরআন করীমের মধ্যে কোন গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

কুরআন করীমের সুরক্ষার বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের স্বীকারুক্তি।

এখানে একথা বলাও আবশ্যক যে, প্রাচ্যবিদরা একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে যে, বর্তমানে মুসলমানদের হাতে ও বক্ষে যে কুরআন করীম সংরক্ষিত আছে, সেটি সেই কুরআন যা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর উপর নাযেল হয়েছিল। কয়েকজন প্রাচ্যবিদের অভিমত উপস্থাপন করা হল।

স্যর উইলিয়ম মিউর -এর অভিমত: ধরাপৃষ্ঠে সম্ভবত কুরআন করীম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ নেই যা সুদীর্ঘ বারোশ বছর যাবৎ কোন পরিবর্তন ছাড়া নিজের আসল অবস্থায় রয়েছে।' তিনি আরও লেখেন , 'আমাদের বাইবেল ও মুসলমানদের অপরিবর্তনশীল কুরআনের তুলনা এমন দুটি বস্তুর সঙ্গে তুলনার সমান যাদের মধ্যে কোন রকম সামঞ্জস্য নেই। " তিনি আরও লেখেন ,'কুরআন করীম এখনও পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই রয়েছে যেমনটি মহম্মদ (সা.) পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। এ বিষয়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন সাক্ষ্য বিদ্যমান। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে একথা বলতে পারি যে, কুরআন করীমের প্রতিটি আয়াত, মহম্মদ থেকে আজ পর্যন্ত, নিজের আসল রূপে অপরিবর্তনশীল অবস্থায় চলে আসছে।"

(লাইফ অফ মুহাম্মদ, পৃ: ২১,২২,২৫,২৬)

জার্মানীর খ্যাতনামা খ্রীষ্টান প্রাচ্যবিদ নওবিল্ড কুরআন শরীফ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বর্তমান কুরআন অবিকল তেমনই আছে যেমনটি সাহাবাদের যুগে ছিল।' অতঃপর তিনি লেখেন, 'ইউরোপের বিদ্বানদের পক্ষ থেকে কুরআনের মধ্যে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রমাণ করার চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। "

(এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা)

প্রফেসর নিকেলসনের অভিমত: ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত খৃষ্টান প্রাচ্যবিদ প্রফেসর নিকেলসন তাঁর ইংরেজি রচনা,'আরবের সাহিত্যের ইতিহাস' পুস্তকে লেখেন, 'ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের ইতিহাস জানার জন্য কুরআন শরীফ এক অতুলনীয় গ্রন্থ যা যাবতীয় সংশয়ের উর্দ্ধে। নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ, খৃষ্ট বা অন্য কোন প্রাচীন ধর্মের কাছে এই ধরণের নির্ভরযোগ্য কোনও ইতিহাস নেই, যেমনটি ইসলাম সম্পর্কে কুরআন করীমে রয়েছে। "

(আরবের সাহিত্যের ইতিহাস)

বিরুদ্ধবাদীদের মতামতের পর সরাসরি একথা বলা যেতে পারে যে, اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ সেটিই শ্রেষ্ঠত্ব যার সম্পর্কে শত্রুরাও সাক্ষ্য দেয়।

(দ্বিতীয় আপত্তি)

আপত্তিকারীরা সহী বুখারীর কয়েকটি হাদীসের ভিত্তিতে আপত্তি করেছে যে, হযরত মহম্মদ (সা.)-এর জীবনের শেষ লগ্নে মুসাইলামা (কাযযাব) নামে এক ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করে বসে আর আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই ব্যক্তি ইয়মামার বাসিন্দা ছিল। তার বিদ্রোহের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তেই সে যখন নৈরাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল, তখন হযরত আবু বাকার (রা.) মুসাইলামার বিদ্রোহ দমন করতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে তেরো হাজার মুসলমান সৈন্যসহকারে রওনা করেন।

(ক্রমশ.....)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নিউজিল্যাণ্ড সফর

অস্ট্রেলিয়ার এক সরকারি রেডিও স্টেশন এস.বি.এস-এর প্রতিনিধিমণ্ডল ২০১৩ সালের ১৯ শে অক্টোবর তারিখে মসজিদ বায়তুল হুদা সিডনি এসে হুযুর আনোয়ার (আ.)-এর যে সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছিল সেটি ৩০ শে অক্টোবর তারিখে এই রেডিও স্টেশনটি সম্প্রচার করে। সম্প্রচারটি মোট দশ মিনিটের ছিল। স্টেশনটি মোট ৭৪টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে এবং সমগ্র অস্ট্রেলিয়ায় এটি শোনা হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এস.বি.এস রেডিওতে সম্প্রচারিত সাক্ষাতকারটি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক অনুষ্ঠানের সূচনাতে পরিচয় গ্রহণের পর বলেন, 'আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে প্রায়ই সংখ্যালঘু সংগঠনগুলির নেতা এবং অস্ট্রেলিয়া আগমণকারী অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের সামনে তুলে ধরি থাকি। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য আহমদী জামাতের আধ্যাত্মিক এবং প্রশাসনিক নেতা মির্যা মসরূর আহমদ অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছেন। তিনি সিডনিতে অনুষ্ঠিত জামাতে বাৎসরিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এই মুহূর্তে সিডনিতে রেকর্ড করা কথোপকথন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। এস.বি.এস-এর এই চিন্তাধারার বিষয়ে একমত হওয়া আবশ্যক নয়, কিন্তু আমরা আশা করি যে আমাদের শ্রোতারা অন্যদের মতামতকেও সেভাবেই সম্মান জানাবে যেমন তারা নিজেদের মতাতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারীদের কাছ থেকে নিজেদের মতামতের জন্য সম্মানের প্রত্যাশা করে থাকে।

এরপর নিম্নোক্ত সাক্ষাতকারটি প্রচারিত হয়।

সঞ্চালক সাক্ষাতকারের প্রথমে বলেন: এই মুহূর্তে আমরা মির্যা মসরূর আহমদ -এর সঙ্গে রয়েছি, যিনি জামাত আহমদীয়ার আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক নেতা। আপনাকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই। হুযুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এরপর সঞ্চালক বলেন, জনাব মির্যা সাহেব! আমি জামাতের ইতিহাস নিয়ে কথা শুরু করতে চাইব। জামাতের গোড়া পত্তন কবে ও কিভাবে হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাস জানতে হলে আপনাকে চৌদ্দশ বছর পেছনে যেতে হবে। যখন আঁ হযরত (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন যুগ আসবে যখন মুসলমানেরা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের শিক্ষা ভুলে বসবে। কুরআন করীম বিদ্যমান থাকবে, কিন্তু তা কেউ মেনে চলবে না। এক অন্ধকারময় যুগ হবে সেটি। সংক্ষেপে এইটুকুই যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে এক ব্যক্তির আগমণ ঘটবে, যিনি আমারই অংশ হবেন এবং আমার শিক্ষা এবং কুরআন করীমের শিক্ষার প্রসার ঘটাবেন, তিনি মসীহ ও মাহদী হবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা বিশ্বাস করি যে, সেই আগমণকারী ব্যক্তি যাবতীয় নিদর্শনসহকারে এসে গিয়েছেন যা আঁ হযরত (সা.) বর্ণনা করেছিলেন এবং ১৮৮৯ সালে তিনি ঘোষণা করেন এবং জামাতের গোড়াপত্তন করেন এবং বয়আত গ্রহণ করেন। আর যে সব নিদর্শনের কথা আঁ হযরত (সা.) বর্ণনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে এটিও একটি ছিল, যেটিকে আমরা স্বর্গীয় নিদর্শন বলতে পারি। অর্থাৎ রমযান মাসের নির্দিষ্ট দিনে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়া। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১৮৯৪ সালের পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে সেই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে গ্রহণ লাগে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা বিশ্বাস করি যে, আগমণকারী মসীহ এবং মাহদী, যার আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী আঁ হযরত (সা.) করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। কেননা, নিদর্শণসমূহও পূর্ণ হয়েছে আর এই উদ্দেশ্যের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এরপর সাক্ষাতকার গ্রহণকারী সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কোন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, কেননা তিনি তো নিজেকে মসীহ হিসেবে দাবি করেছেন। এরপর খিলাফতের ধারা কিভাবে শুরু হল? জামাত আহমদীয়ার মধ্যে খলীফা নির্বাচনের জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ১৯০৮ সালে মসীহ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর খিলাফতের ধারা সূচিত হয়েছে এবং সেই সময় উপস্থিত লোকেরা খিলাফতের জন্য নিজেদের খলীফা নির্বাচন করেন যিনি হলেন হযরত মৌলনা নুরুদ্দীন সাহেব। তিনি তৎকালীন যুগের একজন খ্যতানামা আলেম ছিলেন। ১৯১৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খলীফার যুগের সূচনা হয়। সেই সময় জামাতের মাঝে কিছু ফাটল ধরে। কিন্তু জামাতের সিংহভাগই হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদের বয়আত গ্রহণ করেন। এর পর যারা পিছু হটেছিল, তাদের মধ্য থেকেও অনেকে বয়আতে যোগদান করেছিল। এবং জামাত এইভাবে বেড়ে চলে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের যখন মৃত্যু হল, সেই সময় জামাতের সদস্য সংখ্যা ছিল চার লক্ষ বা এর কিছুটা বেশি। সেই জামাত ক্রমশ উন্নতি করতে করতে আজ বিশ্বের ২০৪টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং এর সদস্য সংখ্যা কোটিতে।

হুযর আনোয়ার বলেন, খিলাফত নির্বাচনের জন্য যথারীতি নিয়ম তৈরী করা হয়েছে। একটি ইলেকটোরাল কলেজ তথা খিলাফত নির্বাচন কমিটি রয়েছে যারা খলীফা নির্বাচন করে। ১৯৮২ সালে খলীফাতুল মসীহ সালেসের মৃত্যুর পর রাবোয়াতে চতুর্থ খলীফার নির্বাচন হয়। কিন্তু এর পর ১৯৮৪ সালের আইনের পর জিয়াউল হক যখন আমাদের জন্য কঠোর আইন বলবৎ করল, আমাদেরকে আসসালামো আলাইকুম বলার অনুমতি ছিল না, নামায পড়ার অনুমতি ছিল না, এমন যে কোন কাজ করতে বাধানিষেধ ছিল যার দ্বারা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটতে পারে। এই কারণে খলীফা এবং নেতা হিসেবে চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব পাকিস্তান থেকে লন্ডন স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হন এবং এর পর অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের পর থেকে সেখানেই খিলাফত রয়েছে। ২০০৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। পাকিস্তানে যেহেতু পরিস্থিতি তেমনই ছিল, তাই পঞ্চম খিলাফতের নির্বাচন হয় লন্ডনের সব থেকে পুরোনো ফজল মসজিদে। সেখানে ২০০৩ সালের ২২ শে এপ্রিল আমাকে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

এরপর সঞ্চালক প্রশ্ন করেন যে, গোলাম (হযরত মির্যা) আহমদ কাদিয়ানী সাহেব এক নতুন প্রকার নবুয়তের দাবি করেছিলেন। এ বিষয়ে কিছুটা স্পষ্ট করবেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল, এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আঁ হযরত (সা.)-এর যুগ থেকে ছিল। যেমনটি আমি বলেছি, আঁ হযরত (সা.) খাতামান্নাবীঈন ছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের ধারণা, আর সেই সময়ও এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে বসে আছেন এবং তিনি পৃথিবীতে আসবেন। আর মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণাও প্রচলিত আছে যে মাহদী (আ.)-এর আগমণ ঘটবে। সাধারণ মুসলমানেরা মনে করে যে, মসীহ ও মাহদী দুই ভিন্ন সত্তা হবে। মসীহ আকাশ থেকে আসবেন আর মাহদী এই উম্মতের মধ্য থেকেই আসবেন। এরপর তাঁরা একত্রে সংস্কার করবেন এবং ইসলামের প্রচার করবেন এবং যুদ্ধ করবেন। তারা একথাও বলে যে হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে আসবেন। যখন তারা আসবেন, তখন এই উপাধি নিয়েই আসবেন। এটা হতে পারে না যে আল্লাহ্ তা'লা এক ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যদা দান করার পর পুনরায় তা ছিনিয়ে নিবেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মসীহ মওউদ হয়ে যিনি আসবেন তিনি আমার উম্মতের মধ্য থেকেই আসবেন। তাঁর আগমণ যেন আমার আগমণ হবে। অর্থাৎ আমার পথের অনুসারী হবে এবং সেই ক্ষমতাবলী নিয়ে আসবেন যা আল্লাহ তা'লা আমাকে দিয়েছেন। কেননা তিনি আমার অনুবর্তিতাকারী হবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কায়িানী (আ) সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসেছেন যা আঁ হযরত (সা.)ও করছেন এবং সূরা জুমা অনুসারে কুরআনেরও এটি ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি কোন কোন নতুন শরিয়ত নিয়ে আসেন নি। বরং তিনি এসেছেন আঁ হযরত (সা.) এর সুন্নত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের দাবি, নবী আসতে পারে, কিন্তু শরীয়তবিহীন। এখন কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারে না। কেননা আঁ হযরত (সা.) খাতামান্নাবীঈন, এখন নতুন কোন শরীয়ত আসতে পারে না। কেননা কুরআন করীম শেষ শরিয়ত তথা খাতামুল কিতাব। অতএব, আমাদের ধর্মবিশ্বাস হল, আমরা শেষ যুগের নবী খাতামান্নাবীঈন আঁ হযরত (সা.) কে মান্য করি। কিন্তু তাঁর অনুবর্তিতায়, ভালবাসায় কোন শরিয়ত ছাড়া নবী আসতে পারে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও একথাই বলেছেন যে তিনি যা কিছু পেয়েছেন তা আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা ও ভালবাসার কল্যাণেই পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আহমদী ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কি সরাসরি আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহী লাভ করতেন বা তিনি সরাসরি আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলতেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা বিশ্বাস করি, যেদিন থেকে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, সে সম্পর্ক আজও প্রতিষ্ঠিত আছে। আল্লাহ্ তা'লার কোন গুণ বিলোপ করা যায় না। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে কেউ একথা বলতে পারে না যে তিনি অতীতে কথা বলতেন, ওহী নাযেল করতেন, কিন্তু এখন আর করেন না। তিনি পূর্বেও কথা বলতেন আর আজও তিনি তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। মানুষ যে সত্য স্বপ্ন দেখে, সেটিও এক প্রকারে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ লাভের একটি মাধ্যম। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ কেবল শোনেনই না, বরং তিনিও কথাও বলেন। যার সঙ্গে চান তিনিও আজও কথা বলেন। অতএব, এই ওহী বা ঐশী বার্তালাপের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কোন গুণকে আমরা স্থান ও কালের গণ্ডিতে বেঁধে রাখতে পারি না, বন্ধও করতে পারি না। (ক্রমশ.....)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ আকবর। তাঁদের [তথা আবু বকর এবং উমর (রা.)-এর] অপ্রকাশিত জীবনের চিত্র এবং তাঁদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা কত মহান! তাঁরা এমন এক বরকতমণ্ডিত সমাধিস্থলে সমাহিত হয়েছেন যে, মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-ও যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা উভয়ে শত ঈর্ষায় সেখানে গোরস্থ হবার বাসনা পোষণ করতেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ২৬ শে নভেম্বর, ২০২১, **এর জুমুআর খুতবা (২৬ নবুয়ত, ১৪০০ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.)-এর দরবারে জ্ঞানী লোকদের, বিশেষ করে যারা পবিত্র কুরআনের জ্ঞান রাখতেন তাদের অনেক বড় পদমর্যাদা ছিল, হোক না তারা অল্পবয়স্ক যুবক বা নবীন কিংবা প্রবীণ। বুখারী শরীফে একটি হাদীস রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উয়াইনাহ্ বিন হিস্ন বিন হুযায়ফাহ্ মদীনায় এসে তার ভাতিজা হুর বিন কায়েসের বাড়িতে উঠেন। হুর বিন কায়েস সেসব লোকের একজন ছিলেন যাদেরকে হযরত উমর (রা.) নিজের কাছে বসাতেন এছাড়া ক্বারীরাও অর্থাৎ কুরআনের আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিরাও হযরত উমর (রা.)-এর কাছে বসতেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিতেন তারা প্রবীণ হোন বা নবীন। উয়াইনাহ্ তার ভাতিজাকে বলেন, হে আমার ভাতিজা! এই আমীরের দৃষ্টিতে তুমি মর্যাদার অধিকারী, তাই তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমার হয়ে তুমি অনুমতি প্রার্থনা কর। হুর বিন কায়েস বলেন, আমি আপনার জন্য তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, এরপর হুর উয়াইনাহ্র জন্য অনুমতি চাইলে হযরত উমর (রা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন। উয়াইনাহ্ তাঁর [অর্থাৎ উমর (রা.)-এর] কাছে এসে বলে, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহর কসম এটি কেমন কথা যে আপনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত ধনসম্পদও দেন না আর আমাদের ও আমাদের সম্পদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত আচরণও করেন না। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) অসন্তুষ্ট হন, এমনকি তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় হুর হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-কে বলেছেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ২০০) অর্থাৎ হে নবী! সর্বদা মার্জনার রীতি অবলম্বন কর এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের উপেক্ষা কর। আর এই উয়াইনাহ্ অজ্ঞদেরই একজন। আল্লাহ্র কসম! হুর যখন তাঁর সামনে এই আয়াত পাঠ করেন তখন হযরত উমর (রা.) সেখানেই থেমে যান আর কোন কিছু বলেন নি। হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্র কিতাব, (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) শুনলে থেমে যেতেন।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুত তফসীর, সূরা আরাফ, হাদীস-৪৬৪২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)-এর দরবারে একজন ধনী ব্যক্তি আসে এবং সেখানে একজন দশ বছরের বালককে বসে থাকতে দেখে সে (তা) খুবই অপছন্দ করে, অর্থাৎ (তার মতে) এমন মহান দরবারে ছোকরাদের কী কাজ? ঘটনাক্রমে সেই ধনী ব্যক্তির কোন কাজে হযরত উমর (রা.) অসন্তুষ্ট হয়ে জল্লাদকে ডাকেন, তখন সেই বালকই চিৎকার করে, وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ও وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ পাঠ করে এবং বলে , হাযা মিনাল জাহেলীন। (একথা শুনে) হযরত উমর (রা.)-এর চেহারা পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যায় আর তিনি নীরব হয়ে যান। তখন তার ভাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিছু মন্তব্য করেছিল তার ভাই বলে, দেখেলে তো! আজ এই বালকই তোমার প্রাণরক্ষা করেছে যাকে তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করছিলে। "

(হাকায়েকুল ফুরকান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২২)

হযরত উমর (রা.) শিশুদের তরবীয়ত বা শিক্ষদীক্ষার কীভাবে ব্যবস্থা নিতেন- সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। ইউসুফ বিন ইয়াকুব বলেন, ইবনে শিহাব আমাকে, আমার ভাইকে এবং যখন আমরা অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম আমার চাচার পুত্রকে বলেছিলেন, বালক হওয়ার কারণে তোমরা নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা হযরত উমর (রা.) যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি বালকদের ডাকতেন এবং তাদের কাছ থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতেন, কেননা তিনি তাদের মেধা ও মননকে প্রখর করতে চাইতেন।

(সীরাত উমর ইবনুল খাত্তাব, প্রণেতা ইবনুল জাউজি, পৃ: ১৬৫)

হযরত ওমরের আত্মাভিমান সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে যখন যুদ্ধের দৃশ্যপট পাল্টে যায় আর মুসলমানদের চরম ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তখন আবু সুফিয়ান তিনবার উচ্চঃস্বরে বলে, তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ রয়েছে? নবী (সা.) সাহাবীদেরকে এর উত্তর দিতে বারণ করেন। এরপর সে তিনবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, লোকদের মাঝে কি আবু কোহাফার পুত্র রয়েছে? এরপর সে তিনবার জিজ্ঞেস করে, এসব লোকের মাঝে কি খাত্তাবের পুত্র রয়েছে? এরপর সে তার সঙ্গীসাথির নিকট ফিরে গিয়ে বলে, এরা সবাই মারা গিয়েছে। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বলেন, হে আল্লাহ্র শত্রু! আল্লাহ্র কসম! তুই মিথ্যা বলেছিস। তুই যাদের নাম নিয়েছিস তারা সবাই জীবিত আছে। এছাড়া যেসব বিষয় তোমার কাছে কষ্টের কারণ সেগুলোর মধ্যে থেকেও তোমার জন্য এখনো অনেক কিছু বাকি রয়েছে। তখন আবু সুফিয়ান বলে, এ যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ আর যুদ্ধ তো (কুপ থেকে পানি উঠানোর) বালতির মত কখনো একদিকে যায় আর কখনও অন্যদিকে অর্থাৎ একবার এ পক্ষের বিজয় হয় আবার অন্যবার অন্য পক্ষের।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩০৩৯)

বায়তুল মালের ধনসম্পদের সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে তিনি কতটা সতর্ক ছিলেন- এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রেয়েছে। যায়েদ বিন আসলাম বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) দুধ পান করার পর এটি তাঁর পছন্দ হয় অর্থাৎ কেউ তাঁকে গ্লাসে দুধ দিলে তিনি তা পান করেন আর পছন্দ করেন। তখন যে তাঁকে দুধ পান করিয়েছিল তিনি (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? সে তাঁকে বলে, সে এক ঝর্ণায় গিয়েছিল যার নামও সে উচ্চারণ করে; সেখানে মানুষ যাকাতের উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল, সেখানে তারা আমার জন্য দুধ দোহন করে যা আমি আমার পানির পাত্রে ঢেলে নিই। (একথা শুনে) হযরত উমর (রা.) গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করে ফেলে দেন। (মোতা ইমাম মালিক, কিতাবুয যাকাত) (আর বলেন,) এটি যাকাতের সম্পদ তাই এ দুধ আমি পান করব না।

বারা বিন মারুরের পুত্র বর্ণনা করেন, একদিন হযরত উমর (রা.) বাড়ি থেকে বের হন আর হাঁটতে হাঁটতে এসে তিনি মিম্বরে চড়েন । তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন, তাঁর এই রোগ নিরাময়ের জন্য মধু সেবনের প্রস্তাব করা হয়, বায়তুল মালে মধুর পাত্র ছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, আপনারা আমাকে অনুমতি দিলে আমি মধু নিব, অন্যথায় এটি আমার জন্য হারাম তথা অবৈধ। তখন লোকেরা তাকে এটি নেওয়ার অনুমতি দেয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

বায়তুল মালের সম্পত্তির সুরক্ষার প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন- এ সম্পর্কে এ ঘটনাটি পূর্বেও বর্ণনা করেছি, তথাপি সংক্ষিপ্তাকারে আবার তুলে ধরছি। একদিন দুপুরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পিছনে থাকা দুটি উটকে তিনি নিজেই হাকিয়ে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন যেন এদিক সেদিক কোথাও হারিয়ে না যায়। ঘটনাক্রমে হযরত উসমান (রা.) দেখেন এবং বলেন, একাজ আমরা করছি , আপনি ছায়ায় চলে আসুন। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমরা আরাম করে ছায়ায় বসে থাক, এটি আমার কাজ আর আমিই করব।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৬৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মুসলমানদের ধনসম্পদ, সম্মান ও প্রতিপত্তি দিয়েছেন কিন্তু তথাপি তারা ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায় নি। তিনি বলেছেন, তোমাদেরও যদি এসব কিছু অর্জিত হয়ে গিয়ে থাকে তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হবে না। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন হবে না বা নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে উদাসীন হবে না। মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি আমার কাচারি ঘরে বসেছিলাম আর এত প্রচণ্ড দাবদাহ ছিল যে, দরজা খোলারও সাহস হচ্ছিল না। এমন সময় আমার দাস বলল, দেখুন! প্রচণ্ড রোদের মধ্যে এক ব্যক্তি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু সময় অতিবাহিত হতেই সেই ব্যক্তি আমার কাচারি ঘরের নিকট পৌঁছায় আর আমি দেখি, তিনি হযরত

উমর (রা.)। তাঁকে দেখেই আমি কিছুটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি আর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করি, এত গরমের মধ্যে আপনি কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন? উত্তরে হযরত উমর (রা.) বলেন, বায়তুল মালের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, যেটির সন্ধানে আমি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন– ***আলাল আরায়েকে ইয়ানযুরুন***। অর্থাৎ তারা সিংহাসনে সমাসীন থাকবে কিন্তু সর্বদা তাদের কাজ হবে নিগরানী বা তত্ত্বাবধান করা। জাগতিক ঐশ্চর্য ও বৈভব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাদেরকে অলস বানাবে না। সেসব সিংহাসনে তারা ঘুমিয়ে থাকবে না, বরং সজাগ ও সতর্ক থাকেব। মানুষের অধিকার প্রদানে সযত্ন থাকবে এবং নিজেদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সুচারুরূপে পালন করে যাবে।

(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪-৩১৫)

সাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে রেওয়ায়েত রয়েছে। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন, একজন ইহুদি ও মুসলমান বিবদমান অবস্থায় হযরত উমর (রা.)-এর নিকট আসে। হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টিতে ইহুদি ব্যক্তি ন্যায়ের ওপর ছিল বলে মনে হয়, তাই তিনি সে অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এরপর সেই ইহুদি বলে, আল্লাহর কসম! আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

(মোতা ইমাম মালিক, কিতাবুল আকযিয়া, রেওয়ায়েত নম্বর-১৪২৫)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মিশরের এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে বলে, হে আমীরুল মু'মেনীন! আমি আপনার নিকট অত্যাচার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি (রা.) বলেন, তুমি উত্তম আশ্রয়স্থল অন্বেষণ করেছ। সেই ব্যক্তি বলে, আমি আমর বিন আস (রা.)-এর পুত্রের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং তার চেয়ে এগিয়ে যাই। এজন্য সে আমাকে চাবুক মারা আরম্ভ করে আর বলে, আমি সম্মানীত ব্যক্তির পুত্র, আমার সামনে যাওয়ার সাহস তুমি কোথায় পেলে? একথা শুনে হযরত উমর (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)কে পত্র লিখেন এবং তাকে তার ছেলে সহ উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত আমর বিন আস (রা.) উপস্থিত হলে হযরত উমর (রা.) বলেন, মিশরীয় ব্যক্তিটি কোথায়? চাবুক তুলে নাও আর মার। সেই ব্যক্তি তাকে মারতে থাকে, অর্থাৎ আমর বিন আস (রা.)-এর পুত্রকে আর হযরত উমর (রা.) বলছিলেন, সম্মানীয় ব্যক্তির পুত্রকে মার। অর্থাৎ সেই মিশরীয় ব্যক্তিকে বলছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, সে তাকে প্রহার করছিল আর আমরা তার প্রহার করা পছন্দ করছিলাম। সে তাকে লাগাতার চাবুক মারতে থাকে, এক পর্যায়ে আমরা চাচ্ছিলাম যে সে এখন তাকে ছেড়ে দিক। এরপর হযরত উমর (রা.) সেই মিশরীয় ব্যক্তিকে বলেন, এখন আমর বিন আসের মাথায় মার। তখন সেই মিশরীয় ব্যক্তি বলে, হে আমীরুল মু'মেনীন তাঁর ছেলে আমাকে প্রহার করেছিল আর আমি প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি। এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে বলেন, লোকদেরকে তুমি কবে থেকে দাস বানিয়ে রেখেছ? অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন হিসাবে জন্ম দিয়েছেন। তখন হযরত আমর বিন আস (রা.) নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মেনীন এই ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না আর এই মিশরীয় ব্যক্তিও আমার নিকট আসে নি।

(কুনযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযাইল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, রেওয়ায়েত নম্বর-৩৬০০৫)

একবার হযরত উমর (রা.)-এর নিকট কিছু সম্পদ এলে তিনি তা মানুষের মাঝে বণ্টন করতে আরম্ভ করেন। এমতাবস্থায় লোকেরা ভিড় করলে হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.) লোকদেরকে বাধা দিতে দিতে অগ্রসর হন এবং হযরত উমর (রা.) -এর নিকটে পৌঁছে যান। তিনি (রা.) তাঁকে চাবুক দিয়ে আঘাত করে বলেন, পৃথিবীতেই তুমি আল্লাহর বাদশাহকে ভয় পাও নি আর ভিড় ঠেলে সামনে চলে এসেছ। তাই আমি ভাবলাম যে তোমাকেও বলে দিই যে, আল্লাহর বাদশাহও তোমাকে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না।

(সীরাত উমর ইবনে খাত্তাব, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৯৭)

হযরত উমর (রা.)-এর মনোবল কত দৃঢ় ছিল- এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। একবার হযরত উমর (রা.) খুতবা দেওয়ার সময় বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের কেউ আমার মাঝে কোন বক্রতা লক্ষ্য করলে সে যেন তা সোজা করে দেয়। একথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, আপনার মাঝে কোন বক্রতা দখলে সেটিকে আমরা আমাদের তরবারি দিয়ে সোজা করে দিব। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ! কেননা তিনি এই উম্মতের মাঝে এমন লোককেও জন্ম দিয়েছেন যে উমরের বক্রতাকে তরবারি দিয়ে সোজা করবে।

(সীরাত উমর ইবনে খাত্তাব, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ১০৭)

হযরত উমর (রা.) খুতবার মধ্যে বলেন, আমাকে তোমরা কল্যাণের আদেশ দিয়ে, মন্দ থেকে বিরত রেখে এবং উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে সাহায্য কর। এরপর আরেক স্থানে হযরত উমর (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় যে আমাকে আমার দোষত্রুটি সম্পর্কে অবগত করবে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২২)

এছাড়া হযরত উমর (রা.)-এর একটি উক্তি বর্ণনা করা হয় আর সেটি হলো, আমি কোন ভুল করলে আমার ভয়ে কেউ আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে না- এটি নিয়েই আমি শংকিত।

(সীরাত উমর ইবনে খাত্তাব, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ১০৭)

একদিন তাঁর নিকট একব্যক্তি এসে জনসমক্ষে বলে , হে উমর! আল্লাহকে ভয় কর। তার একথা শুনে কিছু লোক খুব রাগান্বিত হয়ে যায় এবং তাকে চুপ করাতে চায়। এ অবস্থায় হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, তোমার পরিণাম শুভ হবে না! যদি তুমি (আমার) ত্রুটি না ধরে দাও। পক্ষান্তরে আমাদেরও পরিণতি শুভ হবে না যদি আমরা তা না শুনি।

(সীরাত উমর ইবনে খাত্তাব, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ১০৭)

অর্থাৎ তাকে বলেন, কেবল কথার কথা বলো না বরং নির্দিষ্ট করে বল, কী বলতে চাও। একদিন হযরত উমর (রা.) মানুষের মাঝে ভাষণ দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি কেবল এতটুকু বলেছিলেন যে, হে লোকসকল! তোমরা শোন ও আনুগত্য কর। তখনই জনৈক ব্যক্তি কথার মধ্যে বলে বসে, হে উমর আমরা শুনবও না এবং আনুগত্যও করব না। হযরত উমর (রা.) তাকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর বান্দা! কেন? সে বলে, এর কারণ হলো- বায়তুল মালের যে কাপড় বিতরণ করা হয়েছে তা দিয়ে লোকেরা কেবল কামিসই বানাতে পেরেছে পুরো পোশাক বানাতে পারে নি। আপনিও নিশ্চয় ততটুকুই কাপড় পেয়ে থাকবেন তাহলে আপনার পুরো কাপড় কীভাবে হয়ে গেল? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি তোমার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক। এরপর এদিকে নিজ পুত্র আব্দুল্লাহকে ডাকেন। আব্দুল্লাহ (রা.) তখন বলেন, তিনি তার অংশের কাপড় তার পিতাকে দিয়ে দিয়েছেন যেন পিতার পুরো কাপড় তৈরী হয়ে যায়। একথা শুনে সবাই আশ্বস্ত হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তি বলে, হে আমীরুল মু'মেনীন এখন আমরা শুনব এবং আনুগত্যও করব।

(সীরাত উমর ইবনে খাত্তাব, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ১০৭)

কতিপয় এমন অভদ্র ব্যক্তিও ছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবীদের মুখ থেকে আপনারা কখনোইএ ধরণের কথা শুনবেন না। এরা সেসব লোক যারা পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছে বা এরা একেবারেই অশিষ্ট অশিক্ষিত মূর্খ ছিল। যারা জ্যেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন তাদের মাঝে এ ধরণের বিষয়াদি দেখা যেতো না, তাদের মাঝে ছিল পূর্ণ আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় বিষয়াদিতে ইসলাম স্বাধীনতা প্রদান করে- এ বিষয়ে হযরত উমর (রা.)-এর রীতি কী ছিল? আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর সেখানকার শাসক হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে বার্তা পাঠায় যে, হে আরব জাতিগোষ্ঠী! আমি আপনাদের চেয়ে অধিকতর ঘৃণ্য জাতি তথা পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যকে জিযিয়া প্রদান করতাম। আপনি যদি সম্মত থাকেন তাহলে আমি আপনাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে প্রস্তুত আছি তবে শর্ত হলো আমার অঞ্চলের যুদ্ধবন্দীদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। হযরত আমর বিন আস (রা.) খলীফার কাছে পুরো বৃত্তান্ত লিখে পাঠান। হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে উত্তর আসে, তুমি আলেকজান্দ্রিয়ার শাসকের কাছে এ প্রস্তাব রাখ যে, সে যেন জিযিয়া প্রদান করে কিন্তু যেসব যুদ্ধবন্দী তোমাদের, অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে রয়েছে তাদেরকে এ সিদ্ধান্তে স্বাধীনতা দেওয়া হবে যে, তারা চাইলে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে আর চাইলে স্বজাতির ধর্মে অটল থাকতে পারে। যারা মুসলমান হয়ে যাবে তারা মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে এবং তাদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের মতই হবে কিন্তু যারা স্বজাতির ধর্মে অটল থাকবে তাদের ওপর তাদের অন্যান্য স্বধর্মীয়দের অনুরূপই জিযিয়া বা কর ধার্য হবে। অতঃপর হযরত আমর বিন আস (রা.) সকল বন্দীকে একত্র করেন এবং তাদেরকে যুগ-খলীফার নির্দেশনা পড়ে শোনান হয় তখন অনেক যুদ্ধবন্দী মুসলমান হয়ে যায়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১২-৫১৩)

ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি (রা.) কতটুকু সতর্ক ছিলেন- এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। একবার এক খ্রিষ্টান বৃদ্ধা তার কোন প্রয়োজনে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসে তখন তিনি (রা.) তাকে বলেন, মুসলমান হয়ে যাও তাহলে নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছিলেন। সেই মহিলা উত্তরে বলে, আমি বৃদ্ধ মানুষ আর মৃত্যু আমার দ্বারপ্রান্তে। তিনি (রা.) তার অভাব মোচন করেন কিন্তু পাশাপাশি শঙ্কিত হন যে, কোথাও আবার তার এহেন কাজ এই মহিলার অভাবের অন্যায় সুযোগ নিয়ে তাকে মুসলমান হতে বাধ্য করার যেন নামান্তর না হয়ে যায়। এজন্য তিনি তার এহেন কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে তওবা করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে সোজা পথ দেখিয়েছিলাম আমি তাকে বাধ্য করি নি। অতএব এক্ষেত্রে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। (সীরাত উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ১০১)

আরেকটি ঘটনা রয়েছে হযরত উমর (রা.)-এর একজন খ্রিষ্টান ক্রীতদাস ছিল তার নাম ছিল ইশক। সে বর্ণনা করছে যে, আমি হযরত উমর (রা.)-এর ক্রীতদাস ছিলাম। তিনি (রা.) আমাকে বলেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও যেন মুসলমানদের কোন কোন বিষয়ে তোমার সাহায্য নিতে পারি, কেননা আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে, একান্ত মুসলমানদের বিষয়ে এমন লোকদের দিয়ে কাজ করাই যারা অমুসলিম। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। এতে তিনি (রা.) বলেন, লা ইকরাহা ফিদ্দীন, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই। যখন তার মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন তিনি আমাকে মুক্ত করে দেন এবং বলেন, তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। [সৈয়্যদানা হযরত উমর বিন খাত্তাব, শাখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবি, (উর্দু অনুবাদ), পৃ: ১৮৪]

পশুর প্রতি তাঁর দয়া-মায়ার একটি ঘটনা রয়েছে। আহ্নাফ বিন কায়েস বর্ণনা করেন, আমরা উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে এক প্রতিনিধিদলরূপে মহাবিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আসি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কোথায় অবস্থান করছেন। আমি বলি, ওমুক স্থানে। এরপর তিনি আমার সাথে যাত্রা করেন আর আমাদের বাহন উটের আস্তাবল, অর্থাৎ সেগুলো বাঁধার স্থানে পৌঁছেন এবং প্রতিটি উটকে মনোযোগের সাথে দেখার পর বলেন, তোমরা কি তোমাদের বাহন সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করনা। তোমরা কি জান না যে, এসব প্রাণীরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। তাদেরকে উন্মুক্ত ছেড়ে দাও না কেন যাতে ঘাস-পাতা খেতে পারে?

(সীরাত উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ১৭১)

হযরত উমর (রা.) এমন একটি উট দেখেন যেটির অসহায়ত্ব ও রুগ্নতার চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) স্বীয় হাত উটের পিঠের একটি ক্ষত স্থানের পাশে রাখেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ্‌র কাছে তোর সম্পর্কে না আবার জিজ্ঞাসিত হই।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, বাব যিকরি ইসতিফলাফ উমর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

আসলাম থেকে বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, একবার হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার তাজা মাছ খাওয়ার খুব ইচ্ছা হল। ইয়ারফা নামী হযরত উমরের একজন ক্রীতদাস বাহনে চড়ে অগ্রে-পশ্চাতে চার মাইল পর্যন্ত সন্ধান করে একটি ভালো মাছ ক্রয় করে আনে। এরপর সে বাহনের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং সেটিকে গোসল করায়। ইত্যবসরে হযরত উমর (রা.) এসে পড়েন এবং বলেন, চলো। এরপরই তিনি বাহনকে দেখে বলেন, তুমি এই ঘাম ধুতে ভুলে গেছ যা তার কানের নীচে রয়েছে। তুমি উমরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য একটি পশুকে কষ্টে ফেলেছ! আল্লাহ্‌র কসম! উমর তোমার এই মাছ চেখেও দেখবে না। (কুনযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়েল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮৭, রেয়ায়েত-৩৫৯৬৬)

একবার গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ইরাক থেকে এক প্রতিনিধি দল আসে। তাদের মধ্যে আহ্নাফ বিন কায়েসও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) মাথায় পাগড়ী বেঁধে যাকাতের একটি উটকে আলকাতরা জাতীয় কোন রঙ লাগাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, হে আহ্নাফ! কাপড় খুলে আস এবং এই উটের যত্নে আমীরুল মুমিনীনকে সাহায্য কর। এটি যাকাতের উট। এতে এতীম, বিধবা এবং মিসকীনদের অধিকার আছে।

(কুনযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৩, কিতাবুল খিলাফা মাআল ইমরা/কিসমুল আফআল, হাদীস-১৪৩০৩)

এক ইহুদীর সাথে হযরত উমর (রা.)-এর কথোপকথন সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তারেক হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, ইহুদীদের জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের গ্রন্থে একটি আয়াত রয়েছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। এটি যদি আমাদের প্রতি, অর্থাৎ ইহুদী জাতির প্রতি অবতীর্ণ হত তবে আমরা সে দিনটিতে ঈদ উদ্‌যাপন করতাম। হযরত উমর বলেন, সেটি কোনটি? সে বলে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করেছি এবং তোমাদেরকে আমার সকল নেয়ামত দান করেছি এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনীত করেছি। হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, আমার ঐদিনটির কথা স্মরণ আছে এবং ঐ স্থানটির কথাও যেখানে মহানবী (স.)-এর প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন তিনি (স.) জুমুআর দিনে আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকসানুহু, হাদীস-৪৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, হযরত উমর (রা.)কে এক ইহুদী বলে, কুরআন মজীদে একটি আয়াত আছে, সেটি যদি আমাদের কিতাবে অবতীর্ণ হতো তবে আমরা সেদিন ঈদ উদ্‌যাপন করতাম। হযরত উমর (রা.) বলেন, সেটি কোন আয়াত? সে উত্তর দেয় اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, সে দিনটিতো আমাদের জন্য দুই ঈদের দিন। অর্থাৎ জু মুআর দিন এবং আরাফার দিন, অর্থাৎ এই দিনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬)

কতিপয় বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন। যেমন আশ'আস হতে বর্ণিত যে, আমি ইমাম শা'বীকে বলতে শুনেছি, মানুষকে কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতে দেখলে সে বিষয়ে হযরত উমর (রা.)-এর কর্মপন্থা দেখবে, কেননা হযরত উমর (রা.) পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করতেন না।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩০৪-৩০৫, রেওয়ায়েত নম্বর-৫৮৪১)

ইমাম শা'বী বর্ণনা করেন, আমি হযরত কাবিসাহ্ বিন জাবেরকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে ছিলাম। আমি তাঁর চেয়ে কিতাবুল্লাহকে অধিক পাঠকারী, আল্লাহ্‌র ধর্মের অধিক ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এবং তাঁর চেয়ে উত্তম এর পঠন-পাঠনকারী কাউকে দেখি নি।

(তারিখে দামাস্ক আল কাবীর লি ইবনে আসাকির, খণ্ড-১১, ভাগ-২১, পৃ: ১২৮, দারু আহইয়াইত তুরাস আল আরাবী)

হযরত হাসান বসরী বলেন, তোমরা যদি তোমাদের বৈঠককে সুরভিত করতে চাও তাহলে অধিকহারে হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ কর।

(সীরাত উমর বিন আল খাত্তাব, প্রণেতা- ইবনে জাউজি, পৃ: ২১৭)

মুজাহিদ হতে বর্ণিত যে, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, নিঃসন্দেহে হযরত উমর (রা.)-এর যুগে শয়তান শিকলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল, কিন্তু তিনি (রা.) শহীদ হলে শয়তান পৃথিবীতে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে।

(সীরাত উমর বিন আল খাত্তাব, প্রণেতা- ইবনে জাউজি, পৃ: ২১৭)

হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, (তাঁর মাঝে) কবিসুলভ রুচিবোধ প্রবল ছিল। তিনি নিজে কবিতা বলতেন না, কিন্তু কবিতা শুনতেন, পছন্দ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি হযরত উমর (রা.)-এর সাথে একটি সফরে বের হই। এক রাতে পথ অতিক্রম করতে গিয়ে আমি তাঁর নিকটে যাই। তখন তিনি তাঁর গদির সামনের অংশে চাবুক দিয়ে আঘাত করে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন,

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ يُقْتَلُ أَحْمَدُ وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُونَهُ وَنُنَاضِلُ
وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

অর্থাৎ তোমরা মিথ্যা বলছো। আল্লাহ্‌র ঘর খানা কা'বার শপথ! হযরত আহমদ (সা.) শহীদ হতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁর সুরক্ষায় বর্শা ও তরবারির ঝংকার প্রদর্শন না করি। আমরা তাঁকে ত্যাগ করব না যতক্ষণ আমরা তাঁর পাশে যুদ্ধ করতে করতে নিহত না হই এবং স্বীয় সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের ভুলে না যাব।

وَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا أَبَرَّ وَ أَوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدِ

অর্থাৎ কোন উটনী নিজের পিঠে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে অধিক পুণ্যবান ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী মানুষকে বসায় নি।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৭৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

এক ঐতিহাসিক ডা. আলী মুহাম্মদ সালাবী 'সৈয়দনা হযরত উমর বিন খাত্তাব উনকি শাখসিয়্যাত অওর কারনামে' নামক গ্রন্থে কাব্যরস ও কবিতা লেখার প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কে লেখেন, খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে কবিতার মাধ্যমে হযরত উমর (রা.)-ই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টান্ত প্রদানকারী ছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে কতক ব্যক্তি একথাও লিখেছে যে, তাঁর নিকট এমন বিষয় খুব কমই উত্থাপিত হয়েছে যা সম্পর্কে তিনি কোন পঙ্‌ক্তি শুনান নি। বর্ণনা করা হয় যে, একবার তিনি (রা.) নতুন কাপড় পরিধান করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। লোকজন তাঁকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকে। এতে তিনি (রা.) তাদেরকে উপমা দিতে গিয়ে এই পঙ্‌ক্তি শুনান যে,

لَمْ تُغْنِ عَنْ هُرْمُزٍ يَوْمًا خَزَائِنُهُ وَالْخُلْدُ قَدْ حَاوَلَتْ عَادٌ فَمَا خَلَدُوْا
أَيْنَ الْمُلُوكُ الَّتِي كَانَتْ نَوَافِلُهَا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ إِلَيْهَا رَاكِبٌ يَفِدُ

অর্থাৎ মৃত্যুর সময় হুরমুযের সম্পদ তার কোন কাজে আসে নি এবং আদ জাতি চিরকাল স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু স্থায়ী হতে পারে নি। কোথায় সেই বাদশাহ্'রা যাদের ঝরনা ও ঘাটসমূহে চতুর্দিক থেকে আগত কাফেলা পরিতৃপ্ত হত। [সৈয়্যদানা হযরত উমর বিন খাত্তাব, শাখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবি, (উর্দু অনুবাদ), পৃ: ৩৩৩]

আলী মুহাম্মদ সালাবী লিখেন যে, হযরত উমর সেসব কবিতাই পছন্দ করতেন যেগুলোতে ইসলামী জীবনের ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত হয়, যেগুলো ইসলামী বিশেষত্বের প্রতিফলন ঘটায় আর যেগুলোর অর্থ ইসলামী শিক্ষার বিরোধী এবং ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়। তিনি মুসলমানদেরকে উৎকৃষ্ট মানের কবিতা মুখস্থ করতে উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন, কবিতা শিখ, এগুলোতে সেসব গুণাবলী থাকে যার সন্ধান করা হয়, অধিকন্তু প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞাও থাকে আর উন্নত চরিত্রের দিকে তা দিক-নির্দেশনা দেয়। কবিতার কল্যাণ সম্পর্কে তার চিন্তাধারা কেবল এতটুকুই ছিল না, বরং এটিকে হৃদয়ের চাবি এবং মানবদেহে কল্যাণের প্রেরণা সঞ্চারের কারণ মনে করতেন। তিনি কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, মানুষের সর্বোত্তম কৌশল কবিতার কয়েকটি ছত্রের সৃষ্টি, যেগুলোকে সে নিজ প্রয়োজনের সময় উপস্থাপন করে, সেগুলোর মাধ্যমে দয়ালু এবং উদার ব্যক্তির হৃদয়কে সে কোমল করে তুলে এবং নীচ ব্যক্তির হৃদয়কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে।

অজ্ঞতার যুগের পুরোনো কবিদের কবিতাও তিনি গভীর আগ্রহের সাথে মুখস্থ করতেন, কেননা এর সাথে ঐশী কিতাব অনুধাবন করা এবং বুঝানোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের কাব্যগ্রন্থ মুখস্থ করে নাও আর অজ্ঞ থেক না। শ্রোতারা তাকে জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের কাব্যগ্রন্থ কোনটি? তখন হযরত উমর বলেন, অজ্ঞতার যুগের কবিতাসমূহ। সেগুলোতে তোমাদের কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের তফসীর রয়েছে এবং তোমাদের ঐশী গ্রন্থের অর্থ

রয়েছে। তাঁর এই উক্তি তাঁর শিষ্য এবং কুরআনের ভাষ্যকার আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস-এর এই উক্তির সাথেও সামঞ্জস্য রাখে যাতে তিনি বলেছেন যে, তুমি যখন কুরআন পড় আর যদি তা না বুঝতে পার তাহলে এর অর্থ আরবের কবিতাসমূহের মাঝে সন্ধান কর, কেননা কবিতা রচনার ফলাফল হলো আরবদের কাব্যগ্রন্থ।

[সৈয়্যদানা হযরত উমর বিন খাত্তাব, শাখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবি, (উর্দু অনুবাদ), পৃ: ৩৩৬]

উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ জীবনীকার আল্লামা শিবলী নোমানী তার পুস্তক আল ফারুক-এ কবিতা বা কাব্যের প্রতি তাঁর রুচিবোধের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, কবিতা বলা বা কাব্যের প্রতি মোটের ওপর যদিও হযরত উমরের খ্যাতি স্বল্প আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি কবিতা খুব কমই রচনা করতেন, কিন্তু কবিতার রুচি তার মাঝে এমন উন্নত মানের ছিল যে, তার জীবনের ইতিহাসে এই ঘটনা আমরা কোনভাবে বাদ দিতে পারি না। আরবের এক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত কবির কাব্যের বিরাট অংশ তার মুখস্থ ছিল আর সব কবির কাব্য সম্পর্কে তার বিশেষ বিশেষ অভিমত ছিল। সাহিত্যিকরা সাধারণত এই কথা স্বীকার করে যে, তার যুগে হযরত উমরের চেয়ে বড় কোন কবিতা পাঠক ছিল না।

জাহেয তার বই 'আল বায়ান ওয়াত তাবঈন' -এ লিখেছেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব স্বীয় যুগে কবিতার গভীরতা সবচেয়ে বেশি বুঝতেন। হযরত উমরের সাহিত্যের প্রতি রুচি এত গভীর ছিল যে, উন্নত কবিতা শুনলে তিনি তা বার বার আগ্রহের সাথে পড়তেন। যদিও খিলাফতের দায়িত্বের কারণে তিনি এসব কাজে জড়িত হতে পারতেন না বা জড়ানোর সুযোগ পেতেন না, তা সত্ত্বেও যেহেতু সহজাত রুচি ছিল তাই শত -সহস্রপঙক্তি তার মুখস্থ ছিল। সাহিত্য বিশারদরা বলেন যে, তার এত বেশি কবিতা মুখস্থ ছিল যে, যখনই কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতেন অবশ্যই কোন পঙক্তি বা কবিতা পাঠ করতেন। তিনি শুধু সেসব কবিতা বা পঙক্তি পছন্দ করতেন যেগুলোতে আত্মসম্মানবোধ, স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসম্ভ্রমবোধ, শিক্ষামূলক বিষয়াদি থাকত। এরই ভিত্তিতে সেনা কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষকে কবিতা মুখস্থ করার নির্দেশ দেওয়া হোক। যেমন আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে তিনি এই নির্দেশ লিখে পাঠান যে, মানুষকে কবিতা বা কাব্য মুখস্থ করার নির্দেশ দাও, কেননা তা উন্নত নৈতিক বিষয়াদি এবং সঠিক মতামত আর ইনসাফ তথা ন্যায়বিচারের পথে পরিচালিত করে থাকে। সব জেলায় তিনি যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার বাক্যাবলী ছিল এইরূপ:

নিজ সন্তানদের সাঁতার কাটা এবং ঘোড়ায় আরোহন করা শিখাও। আর প্রবাদবাক্য এবং উন্নত মানের পঙক্তি মুখস্থ করাও, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি কর। এখানে এ কথাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, হযরত উমর কবিতা ও কাব্যের বহু ত্রুটি দূর করেছেন। সে সময় পুরো আরবে যে রীতি প্রচলিত ছিল তা হলো, কবিরা ভদ্র মহিলাদের নাম প্রকাশ্যে কবিতায় উল্লেখ করত আর তাদের প্রতি নিজ ভালোবাসা প্রকাশ করত। হযরত উমর এই প্রথার অবসান করেন, আর এর কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেন। একইভাবে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লেখাকে তিনি অপরাধ আখ্যায়িত করেন আর প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্গাকবি হুতায়াকে এই অপরাধে তিনি কারাগারে প্রেরণ করেন। (আল ফারুক প্রণেতা-শিবলী নোমানী, পৃ: ৩৩০-৩৩৩)

আল্লামা শিবলী নোমানী আরও লিখেন যে, সেই যুগের সবচেয়ে বড় কবি ছিল মুতাম্মেম বিন নুয়ায়রা, যার ভাইকে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের যুগে হযরত খালেদ ভুলবশত হত্যা করেছিলেন। এই ঘটনা তাকে এতটা দুঃখভারাক্রান্ত করে যে, সে সবসময় কাঁদতো এবং শোকগাথা লিখতো। হযরত উমরের কাছে আসলে তিনি তাকে শোকগাঁথা শোনানোর নির্দেশ দেন। সে কিছু পঙক্তি পাঠ করে মাত্র। হযরত উমর তাকে বলেন, আমি যদি এমন শোকগাঁথা লিখতে পারতাম তাহলে আমি আমার ভাই যায়েদের উদ্দেশ্যে তা শোনাতাম বা লিখতাম। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আমার ভাই আপনার ভাইয়ের মতো মারা যেতো, অর্থাৎ শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করত তাহলে আমি তার জন্য আদৌ শোক করতাম না।

হযরত উমর সবসময় বলতেন যে, আর কেউ মুতাম্মেমের মতো আমাকে সমবেদনা জানায় নি। (আল ফারুক প্রণেতা-শিবলী নোমানী, পৃ: ৩৪৫)

হযরত উমরের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত কোন কোন ঘটনা সম্পর্কে মনে করা হয় যে, তা একবারই পূর্ণ হবে, সেগুলো যদি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় বা অন্য কারো মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যেমনটি কিনা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, 'রোমান এবং পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি তাঁর হাতে রাখা হয়েছে'। এটি জানা কথা যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। আর তিনি (সা.) রোমান এবং পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডারও দেখেন নি আর চাবিও দেখেন নি। কিন্তু যেহেতু অবধারিত ছিল যে, সেসব চাবি হযরত উমর (রা.) লাভ করবেন তাই হযরত উমরের অস্তিত্ব প্রতিচ্ছায়ারূপে যেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরই সত্তা ছিল, এই কারণে ওহীর জগতে হযরত উমরের হাতকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর হাত আখ্যায়িত করা হয়েছে।"

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৬৫)

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, সিদ্দীকে আকবর (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত যুন্নুরাঈন (রা.) আর হযরত আলী মুর্তজা (রা.) সকলেই সত্যিকার অর্থে ধর্মের ক্ষেত্রে আমীন বা বিশ্বস্ত ছিলেন। আবু বকর (রা.), ইসলামের দ্বিতীয় আদম ছিলেন। একইভাবে হযরত উমর ফারুক আর হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে আমীন বা বিশ্বস্ত না হতেন তাহলে আজ কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছিল।" (মকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড,পৃ: ১৫১, মকতুব নম্বর-২, মকতুব বনাম হযরত খান সাহেব মহম্মদ আলি খান সাহেব, রাবোয়া থেকে মুদ্রিত)

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমাকে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে খিলাফত সম্পর্কে নিশ্চিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আর গবেষকদের ন্যায় আমি এই বিষয়ের গভীরে অবগাহন করেছি আর আমার প্রভু আমার কাছে এটি প্রকাশ করেছেন যে, সিদ্দীক ও ফারুক এবং উসমান (রা.) পুণ্যবান এবং মু'মিন ছিলেন। আর সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মনোনীত করেছেন আর যারা রহমান খোদার বিশেষ দানে ধন্য হয়েছেন। অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী তাদের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা মহা সম্মানিত খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, প্রত্যেক রণক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রবেশ করেছেন আর গ্রীষ্মের দুপুরের দাবদাহ এবং শীতের রাতের ঠাণ্ডার পরোয়া করেন নি, বরং সদ্য যৌবনে উপনীত যুবকের ন্যায় ধর্মের পথে অগ্রগামী হয়েছেন, আর স্বজন বিজনের প্রতি আকৃষ্ট হন নি এবং মহা সম্মানিত খোদার খাতিরে সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাদের আমলে সৌরভ ও তাদের কর্মে সুগন্ধি রয়েছে, আর এই সবকিছু তাদের পদমর্যাদার বাগান এবং তাদের পুণ্যের গুলিস্তানের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে আর তাদের প্রভাত সমীরণ নিজ সুরভিত বাতাসের ঝাপটায় তাদের রহস্যাবলীর সন্ধান প্রদান করে। আর তাদের জ্যোতি নিজ পূর্ণ দীপ্তির সাথে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়। অতএব তুমি তাদের সৌরভের মাধ্যমে তাদের পদমর্যাদার ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে অবগত হও আর তড়িঘড়ি করে কুধারণার অনুবর্তী হয়ো না এবং কোন কোন রেওয়ায়েতের ওপর ভরসা করো না, কেননা সেগুলোতে মারাত্মক বিষ এবং অনেক বাড়াবাড়ি রয়েছে। আর সেগুলো নির্ভরযোগ্য হয় না। এসব রেওয়ায়েতের অনেকগুলোই ধ্বংসাত্মক ঝড় এবং বৃষ্টির ভ্রম সৃষ্টিকারী বিদ্যুৎ চমকের ন্যায়। অতএব আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর আর এসব (রেওয়ায়েতের) অনুসরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(সিররুল খোলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ২৫-২৬)

তিনি আরও বলেন, " খোদার কসম, আল্লাহ্ তা'লা শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর এবং উমরকে) আর তৃতীয়ত যিনি যুন্নুরাইন, তাদের প্রত্যেককে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাহিনীর অগ্রসেনা বানিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাদের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করে এবং তাদের (সত্যতার) স্পষ্ট প্রমাণকে তুচ্ছজ্ঞান করে আর তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণ করে না, বরং তাদের অসম্মান করে এবং তাদের নামে অপলাপ করতে ব্যগ্র থাকে এবং বাজে কথা বলে, এমন ব্যক্তির অশুভ পরিণাম এবং ঈমান নষ্ট হওয়ার বিষয়ে আমার আশঙ্কা রয়েছে। আর যারা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছে এবং অপবাদ আরোপ করেছে, হৃদয়ের কঠোরতা এবং রহমান খোদার ক্রোধ তাদের পরিণতি হয়েছে। আমার পুনঃ পুনঃ যে অভিজ্ঞতা হয়েছে আর স্পষ্টভাবে যা আমি প্রকাশও করেছি তা হলো, এসব পুণ্যবানের প্রতি ক্রোধ এবং বিদ্বেষ পোষণ করা কল্যাণের উৎস খোদার সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কহীনতার কারণ। আর যে-ই তাদের প্রতি শত্রুতা করেছে এমন ব্যক্তির জন্য রহমত এবং দয়ার সব পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। আর জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার তার জন্য খোলা হয় না। আল্লাহ্ এমন লোকদেরকে জাগতিক ভোগবিলাসের মাঝে ছেড়ে দেন এবং জাগতিক কামনা বাসনার গহ্বরে ঠেলে দেন আর তাকে নিজের দরবার থেকে প্রত্যাখ্যাত এবং বঞ্চিত করে দেন।

তাদেরকে, অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীনকে সেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে যেভাবে নবীদের কষ্ট দেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে সেভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছে যেভাবে প্রত্যাদিষ্টদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। এভাবে তারা যে রসূলদের উত্তরাধিকারী ছিলেন তা প্রমাণিত হয়ে গেছে আর কিয়ামত দিবসে তাদের পুরস্কার বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের ইমামদের মতো অবধারিত হয়ে যায়, কেননা মু'মিনকে যখন কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও অভিসম্পাত করা হয় আর কাফের আখ্যা দেওয়া হয় এবং বিনা কারণে তাদের ব্যঙ্গ করা হয় আর তার নামে আজেবাজে কথা বলা হয় তখন সে নবীদের সদৃশ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের মতো হয়ে যায়। অতঃপর তাকে প্রতিদান দেওয়া হয় যেমনটি নবীদের প্রতিদান দেওয়া হয়ে থাকে আর সে প্রত্যাদিষ্টদের ন্যায় পুরস্কার লাভ করে। তারা নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের আনুগত্যে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর মহা সম্মানিত খোদা যেভাবে তাদের প্রশংসা করেছেন (সে অনুসারে) তারা অসাধারণ এক উম্মত ছিলেন। আর তিনি স্বয়ং তাদেরকে সেভাবে সমর্থন করেছেন যেভাবে নিজের সব মনোনীত বান্দাদের তিনি সমর্থন ও সাহায্য করেন। সত্যিকার অর্থে তাদের নিষ্ঠার জ্যোতি ও তাদের পবিত্রতার লক্ষণাবলী পূর্ণ দীপ্তির সাথে প্রকাশ পেয়েছে। আর এটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা সত্যবাদী ছিলেন আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 6-13 Jan, 2022 Issue No. 1-2

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন আর তিনি তাদেরকে সে সবকিছু দিয়েছেন যা এই বিশ্বজগতে অন্য কাউকে দেওয়া হয় নি।"

(সিররুল খোলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ২৮-৩০)

শিয়াদের একটি কথা খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, "শিয়াদের মাঝে যারা মনে করে যে, আবু বকর সিদ্দীক বা উমর ফারুক আলী মুর্তজা বা ফতেমাতুয যাহরা-র অধিকার হরণ করেছেন এবং তাদের প্রতি অন্যায় করেছেন, এমন ব্যক্তি ন্যায় পরিত্যাগ করে অন্যায়কে ভালোবেসেছে আর সীমালঙ্ঘনকারীদের পন্থা অবলম্বন করেছে। নিশ্চয় সেসব লোক, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের জন্য প্রিয় স্বদেশ, বন্ধুবান্ধব এবং ধনসম্পদ পরিত্যাগ করেছে আর যাদেকে কাফেরদের পক্ষ থেকে দুঃখকষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং যারা দুষ্কৃতিপরায়নদের হস্তক্ষেপে বাড়ি ছাড়া হয়েছেন তবুও তারা উত্তম ও পুণ্যবান লোকদের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করেছেন, তারা খলীফা মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঘরবাড়ি সোনা-রুপা দিয়ে ভর্তি করেন নি এবং নিজ ছেলে-মেয়েদেরকে সোনা ও রুপার উত্তরাধিকারী বানান নি বরং যা-কিছু অর্জিত হয়েছে, তা বায়তুল মালে সমর্পণ করেছেন আর বস্তুপূজারী এবং পথভ্রষ্টদের ন্যায় তারা পুত্রদেরকে নিজের খলীফা মনোনীত করেন নি। তারা এ পৃথিবীতে দারিদ্র ও দীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছেন আর তারা আমীর এবং ধনীদের ন্যায় ভোগবিলাসিতার প্রতি ঝুঁকে যান নি। তাদের বিষয়ে কি এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, তারা অন্যায়ভাবে মানুষের ধনসম্পদ হস্তগতকারী ছিলেন আর অধিকার হরণ করেছেন, লুটতরাজ করেছেন এবং রাহাজানীর প্রতি তাদের ঝোঁক ছিল? তাদের ওপর বিশ্বের গর্ব রসূল (সা.)-এর পবিত্র সাহচর্যের এ ফলাফলই ছিল! অথচ সমস্ত জগতের প্রভু আল্লাহ্, তাদের গুণকীর্তন করেছেন।

প্রকৃত বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লা তাদের আত্মাকে পবিত্র করেছেন এবং এবং তাদের হৃদয়কে পবিত্রতা দান করেছেন, তাদের সত্তাকে আলোকিত করেছেন এবং ভবিষ্যৎ পবিত্রাত্মাদের অগ্রজ বানিয়েছেন। তাঁদের সাথে অন্যায়ের কোন সম্পর্ক দেখানো দূরে থাক, আমরা এমন কোন বিষয়ের ক্ষীণ সম্ভাবনাও দেখি না বা আমরা ঘুণাক্ষরেও এমন কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারি না যা তাঁদের রুগ্ন মন-মানসিকতা বা তাঁদের সামান্যতম পাপের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা ন্যায়পরায়ন মানুষ ছিলেন। এক উপত্যকা পরিমান অবৈধ সম্পদও যদি তাঁদেরকে দেওয়া হত, তাঁরা তাতে থুথুও ফেলতেন না। পর্বতসম বা পৃথিবীসম স্বর্ণও যদি থাকত তবুও তাঁরা কামনা-বাসনার পুজারীদের ন্যায় এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন না। কোন বৈধ সম্পদ পেলে তাঁরা তা মহা প্রতাপের অধিকারী আল্লাহ্‌র পথে ধর্মীয় কাজে ব্যয় করতেন। অতএব আমরা কী করে ভাবতে পারি, তাঁরা নবীজীর কলিজার টুকরো হযরত ফাতেমাতুয যাহরাকে কয়েকটি গাছের জন্য ক্ষিপ্ত করতে ও নবী-কন্যাকে দুষ্কৃতকারীদের মত কষ্ট দিতে পারেন? সত্য কথা হল, সাধুজনরা সদিচ্ছা রাখেন, তাঁরা সত্যের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁদের ওপর খোদার পক্ষ থেকে অনেক কল্যাণ বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা খোদাভীরুদের হৃদয়ের গোপন চিত্র সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"

(সিররুল খোলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৩৭-৩৯)

এরপর তিনি বলেন, 'সত্য কথা হলো, হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) উভয়েই প্রথম জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা অধিকার প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি করেন নি। তাঁরা তাকওয়ার পথকে জীবনের মূলমন্ত্র আর ন্যায় নীতিকে লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করতেন আর রহস্যের মূল উদ্‌ঘাটনের বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু থাকতেন। ইহজাগতিক কামনাবাসনা চরিতার্থ করা কখনও তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁরা নিজেদের জীবনকে খোদার আনুগত্যের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। প্রভূত কল্যাণ ও মহানবী (সা.)-এর ধর্মের সাহায্যকারী হিসেবে শায়খাইন [তথা হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)]-এর মত অন্য কাউকে আমি দেখতে পাই নি। মানবকুল-সূর্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁরা চন্দ্রের তুলনায় বেশি গতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা তাঁর (সা.) ভালবাসায় বিলীন ছিলেন এবং সত্য ও সঠিক পথকে লাভ করার বাসনায় সব কষ্টকে সুমিষ্ট বিষয় বলে জ্ঞান করতেন। তাঁরা অনন্য ও অদ্বিতীয় নবীর জন্য সব লাঞ্ছনাকে সানন্দে বরণ করেছেন।কাফের বাহিনী ও সত্যবিরোধী শত্রুসেনার মোকাবেলায় তারা সিংহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এর ফলে এক পর্যায়ে ইসলাম জয়যুক্ত হয়েছে আর বিরোধী বাহিনী পরাজিত হয়েছে, শিরক বা খোদার অংশীবাদিতা দুর্বল হতে হতে নির্মূল হয়ে গেছে এবং মুসলমান ও ইসলামের সূর্য ঝলমল করে উঠেছে। বহুমুখী ও প্রশংসনীয় ধর্মসেবা এবং মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন ধরণের অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শনের পাশাপাশি সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ ছিল তাঁদের জীবনের শুভ পরিণতি। এটি আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহ যে বিষয়ে মুত্তাকীরা অনবহিত নন। নিঃসন্দেহে ফযল বা অনুগ্রহ খোদার হাতে, তিনি যাকে চান- তা দান করেন। পুরো নিষ্ঠার সাথে তাঁর আঁচল যে আঁকড়ে ধরে, গোটা জগত তার বিরোধিতা করলেও আল্লাহ্ তাকে কক্ষনও বিফল মনোরথ হতে দেন না। আল্লাহ্ অন্বেষী কোন ক্ষতি এবং সংকীর্ণতার মুখোমুখি হয় না এবং আল্লাহ্ সত্যবাদীদের কখনও অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় পরিত্যাগ করেন না।

আল্লাহু আকবর। তাঁদের [তথা আবু বকর এবং উমর (রা.)-এর] অপ্রকাশিত জীবনের চিত্র এবং তাঁদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা কত মহান! তাঁরা এমন এক বরকতমণ্ডিত সমাধিস্থলে সমাহিত হয়েছেন যে, মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-ও যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা উভয়ে শত ঈর্ষায় সেখানে গোরস্থ হবার বাসনা পোষণ করতেন। কিন্তু এ পদমর্যাদা শুধু আকাঙ্খা করলেই পাওয়া যায় না বা চাইলেই দেওয়া হয় না বরং তা সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে এক চিরস্থায়ী রহমত। এ রহমত শুধু তাঁদেরই লাভ হয় যাঁদের ওপর থাকে খোদার সুদৃষ্টি এবং যাঁদেরকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের চাদর আগাগোড়া আবৃত করে রাখে।"

(সিররুল খোলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৭৭-৭৯)

তিনি (আ.) আরও বলেন: "মহানবী (সা.)-এর পর ইসলামের যে উন্নতি-ই সাধিত হয়েছে, তা আসহাবে সালাসাহ তথা এই তিনজন সাহাবীর মাধ্যমেই হয়েছে। হযরত উমর (রা.) যা কিছু করে গিয়েছেন, যদিও তা কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখার মত নয়, কিন্তু তাঁর কার্যক্রম কোনভাবেই সিদ্দীকে আকবর তথা সবচেয়ে বড় সত্যবাদী (হযরত আবু বকর) (রা.)-এর কর্মকে ছোট করে দেখাতে পারবে না, কেননা সফলতার মূল ভিত্তি হযরত আবুবকর (রা.)-ই রেখেছিলেন এবং বিশাল বড় যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল, তিনিই তা নির্মূল করেছিলেন। সেই সময় যেসকল সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হযরত আবু বকর (রা.)কে হতে হয়েছে, তা হযরত উমরকে কখনই হতে হয় নি। সুতরাং হযরত আবু বকর (রা.) পথ সুগম করে দিয়েছেন, আর সেই পথ ধরে হযরত উমর বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করেছেন।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪১৪-৪১৫)

হযরত মৌলবী আবদুল করিম শিয়ালকোটি সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এরহৃদয়ে মহানবী (সা.) এবং শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর প্রতি যে ভালবাসা ও সম্মান ছিল এ সম্পর্কে লিখেন, একদা এক ব্যক্তি যিনি মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রেমে বিভোর ছিলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আমরা আপনাকে শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-এর থেকে মর্যাদার দিক থেকে উত্তম এবং মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার নিকটবর্তী মর্যাদার অধিকারী মনে করবো না? হযরত মসীহ মওউদ এর বিনয় ও সততা দেখুন! একথা শুনে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং আপাদমস্তকে এক অদ্ভুত অস্থিরতা ও ব্যকুলতা ছেয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আমি মহাপ্রতাপান্বিত ও অতি পবিত্র আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, এই মুহূর্তটি মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমার ঈমান আরও দৃঢ় করে দিয়েছে। তিনি (আ.) এরপর বিরতিহীন ৬ ঘন্টা একটি পরিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করার সময় আমি ঘড়ি দেখেছিলাম এবং যখন তিনি (আ.) বক্তৃতা শেষ করলেন, তখন তাকিয়ে দেখি কাঁটায় কাঁটায় ৬ ঘন্টা তিনি (আ.) বক্তৃতা করেছেন। এক মিনিটও এদিক ওদিক হয় নি। এত দীর্ঘ সময় ধরে একটি বিষয় বর্ণনা করা এবং বিরতিহীনভাবে বক্তৃতা করা একটি অলৌকিক বিষয়ই বটে। পুরো বক্তৃতায় তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং একজন ভৃত্য ও আজ্ঞাবহ দাস হিসেবে মহানবী (সা.) এবং জনাব শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-এর গুণাবলী বর্ণনা করেন। (তিনি বলেন) এগর্ব আমার জন্য যথেষ্ট যে আমি তাদের স্তুতিগান গাই এবং আমি তাদের পদধূলি তুল্য।"

আল্লাহ তা'লা তাদের কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন কিয়মাত পর্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তি তা লাভ করতে পারবে না। মহানবী (সা.) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আর আগমণ করবেন না, যে কেউ তাঁর সেসব সেবা করার সম্মান পাবে যা শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) পেয়েছিলেন।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪১৪-৪১৫)

হযরত উমর (রা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা এখানে এসে শেষ হচ্ছে অর্থাৎ আজকের খুতবায়। ইনশাআল্লাহ পরবর্তিতে যদি আল্লাহ তা'লা সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা আরম্ভ হবে।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir